জরুরি অবস্থায় সেই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ
— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

আত্মঘাতী নকশালবাড়ি, স্বাধীনতার রক্তক্ষয়
— পৃঃ ২৭

৬৭ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা ।। ১৩ জুলাই ২০১৫ ।। ২৭ আষাঢ় - ১৪২২ ।। website : www.eswastika.com

জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলি

৪০ বছর আগে এদেশে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল প্রায় সব বিরোধী নেতাকে। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল সংবাদমাধ্যমের উপর। সারা দেশটাই যেন জেলখানায় পরিণত হয়েছিল।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ২৭ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৩ জুলাই - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015
R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ■ ৬-৯
নেহরুর মুসলমান তোষণ নীতির ফল আজও ভারতবাসীকে ভুগতে হচ্ছে কাশ্মীরে ■ গূঢ়পুরুষ ■ ১০
খোলা চিঠি : কর্মখালি ঃ দলদাস উপাচার্য চাই ■ সুন্দর মৌলিক ■ ১১
স্বৈরতন্ত্রের অবসান ■ ১২
আতঙ্কের একুশ মাস ■ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ■ ১৩
জরুরি অবস্থার সেই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ ■ অজিত বিশ্বাস ■ ১৬
ধর্ম ও বিজ্ঞান : মেলবন্ধনের ভাবনা ■ বিরাজ নারায়ণ রায় ■ ২০
প্রভু জগন্নাথের নবকলেবর ■ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ■ ২১
মাহেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত রথযাত্রা ■ সপ্তর্ষি ঘোষ ■ ২৩
অভ্যন্তরীণ নজরদারিই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ■ রাম মাধব ■ ২৭
রাজনীতিতে টিকে থাকতে সিপিএমের সুবিধাবাদী কৌশল ■ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ■ ২৯
উল্টো বুঝলি রাম... ■ দেবাংশু ঘোড়ই ■ ৩১

নিয়মিত বিভাগ
চিঠিপত্র : ১৯ ■ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ■ **অঙ্গনা : ২৬** ■ **অন্যরকম : ৩৩** ■ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৭** ■ **খেলা : ৩৯** ■ **শব্দরূপ : ৪০** ■ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

রাজ্যে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে এখন চলছে নৈরাজ্য। রায়গঞ্জ কলেজে অধ্যক্ষকে প্রহার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ, প্রেসিডেন্সী, কল্যাণী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিগ্রহ— এরকম একটার পর একটা ঘটনা প্রায় নিত্যদিন রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলিকে কলুষিত করে চলেছে। এই নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ। লিখেছেন— ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, দেবীপ্রসাদ রায় প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন।। মূল্য : ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শিক্ষাঙ্গনে অধ্যাপক নিগ্রহ

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে তৃণমূলীদের হাতে উপাচার্য-সহ অধ্যাপকদের নিগ্রহের ঘটনায় সকলেই প্রতিবাদ এবং নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু রাজ্যের শাসকদল কানে তুলো এবং পিঠে কুলো বাঁধিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। চিরকাল শাসকেরা তাই করিয়া থাকেন। বাম রাজত্বেও একই অবস্থা বারম্বার ঘটিয়াছে। আজ যে শাসকদলের ছাত্রদের তাণ্ডবে সমগ্র রাজ্যে শিক্ষার সর্বনাশ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তাহার সূচনা হইয়াছিল বামরাজত্বে। বাম জামানায় শিক্ষায় অনিলায়নের দাপটে যাহা চলিয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছাত্রতাণ্ডব দেখিয়া যাহারা বিস্ময়ে অবাক হইতেছেন তাঁহাদের জানা নাই এই ধরনের কলঙ্কজনক অধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম নয়। বামপন্থী হইয়াও উপাচার্য সন্তোষকুমার ভট্টাচার্যকে বামপন্থীদের হাতেই যেভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা তুলনারহিত। দুর্ভাগ্যের কথা, সন্তোষ ভট্টাচার্যের লাঞ্ছনায় সেদিন যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন আজ তাঁহারাই অন্যকে লাঞ্ছনা করিতেছেন নির্দ্বিধায়। সেইদিন বামপন্থী তথা সিপিএম গুণ্ডারাজের অবসানকল্পে যাঁহারা স্লোগান দিয়াছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে দলতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র চাই; গুণ্ডাতন্ত্র নয়, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ চাই—আজ মসনদে বসিয়াই তাঁহাদের বদলে গিয়াছে মতটা। তাই বামপন্থী বজ্জাতির পরিবর্তে আজ তৃণমূলী বজ্জাতি চলিতেছে। নূতন বোতলে গুণ্ডাবাজির সেই পুরাতন মদ। লাল গুণ্ডাবাহিনীর পরিবর্তে সবুজ গুণ্ডাবাহিনীর উৎপাত কলেজে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাহাদের জয়গানে হাততালির অভাব নাই। সেদিনের প্রতিবাদী চরিত্র স্বনামধন্য অধ্যাপকরা আজ ক্ষমতার লোভে নিশ্চুপ হইয়া রহিয়াছেন। আর শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা তো গোপাল ভাঁড়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কলেজে কলেজে তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের মদত করিবার পাণ্ডা তিনি। তাঁহারই মদতে দুর্বিনীত দুর্নীতিপরায়ণ ছাত্র কিছু লাফাঙ্গা আজ ঠগির ভূমিকা পালন করিতেছে। শঙ্কুদেব পণ্ডা, অশোক রুদ্র, সৌরভ চক্রবর্তীর মতো কিছু মাফিয়া আজ শিক্ষাজগতে বিরাজ করিতেছেন। বামরাজত্বে এই ঘটনা ঘটিলে আজকের মুখ্যমন্ত্রী চিল চিৎকারে রাজত্ব মাথায় করিতেন কিন্তু আজ তিনি বোবা কালায় পরিণত। তাঁহার মোসাহেবরা যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন তাহা কী মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান রক্ষা করিতেছে। রাজ্যের মানুষ কী এই পরিবর্তন চাহিয়া ছিলেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ২০১১ সালে যখন ক্ষমতায় আসিয়াছিল তখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে উচ্চশিক্ষা প্রাঙ্গণ হইতে তিনি দলতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া ছাড়িবেন। কিন্তু সেই কাজ তো করেনইনি, বরং বামফ্রন্টের মতো উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁহার সরকারের প্রভাব আরও বাড়াইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রথমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগে নিয়ন্ত্রণ চালুর ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন বদল করিয়া উপাচার্য পদে কীভাবে দলীয় বশংবদকে বসানো যাইতে পারে সেই ব্যবস্থা তিনি করেন। রাজ্য সরকার মুখে নানা গালগল্প শুনাইলেও শিক্ষাক্ষেত্রে দলতন্ত্র ঢোকাইতে বদ্ধপরিকর। মানুষের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা কেন? চৌত্রিশ বৎসর শিক্ষাক্ষেত্রে সিপিএমের দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আজ নিজেই সিপিএমের দেখানো পথে চলার জন্য তাঁহার লজ্জিত হওয়া উচিত। ইহার পরও যখন কেহ কেহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মা সারদার তুলনা করিয়া থাকেন তখন তাহা বাচালতা বলিয়াই মনে হয়। মা সারদা অনুগামীদের এই বাচালদের ধিক্কার জানানো উচিত।

সুভাষিতম্

কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ রিপুঃ।
অর্থতস্তু নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা।।
কেউ কারো মিত্র নয় অথবা কেউ কারো শত্রু নয়। কারণবশতই লোকে শত্রু ও মিত্র তৈরি হয়।

মহারাষ্ট্র সরকারের মাদ্রাসা নীতি

সাম্প্রদায়িক তাস খেলতে চাইছে কং-কম্যু ও মৌলবিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি মহারাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্ত হলো— রাজ্যে যেসব মাদ্রাসা তাদের পাঠক্রমে মূলধারার বিষয়গুলি (মূলত বিজ্ঞান ও গণিত) রাখবে না, এদের ছাত্রদের 'স্কুল-ছুট' হিসেবে গণ্য করা হবে। এই ঘোষণায় কিছু অপ্রিয় সত্য সামনে এসেছে। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট-সহ অন্যান্য অধিকাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং মুসলমান মৌলবিরা যে বিষয়টা নিয়ে সাম্প্রদায়িক তাস খেলতে চাইছে ইতিমধ্যেই তা স্পষ্ট হয়েছে। সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য মুকতার আব্বাস নাকভি। তাঁর বক্তব্য, এটা আসলে কংগ্রেসের বিভাজন রাজনীতির ফসল যেখানে মাদ্রাসা-কে পোশাকি স্কুলের বাইরে রাখার কৌশলগত অবস্থান নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন : 'শিক্ষার অধিকার আইন বলে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার পোশাকি স্কুলের আওতার বাইরে মাদ্রাসা-কে রেখেছে। এটা তাদের রাজনৈতিক চাল।

মহারাষ্ট্রে মাদ্রাসাগুলি পরিচালিত হয় সাধারণত চ্যারিটি কমিশন বা রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে কিংবা স্বাধীনভাবে। সিংহভাগ মাদ্রাসাতেই ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধর্মীয় শিক্ষার আড়ালে যে মৌলবাদী শিক্ষার বীজ লুকিয়ে রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ১৮৮৯টি মাদ্রাসায় প্রায় দেড় লক্ষ ছাত্রের মধ্যে পূর্বতন সরকারের আমলে মাত্র ৫৫০ জন ছাত্র গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজি ইত্যাদি মূলধারার বিষয়ে শিক্ষা নিতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই বিষয়গুলি ছাড়া কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা হতে পারে না। মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষায় মৌলবি কিংবা মৌলবাদী ব্যতীত আর কিছু হওয়া যে সম্ভব নয় তা স্পষ্ট। তাহলে প্রশ্ন এই যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছাত্র ধর্মীয় শিক্ষা পাচ্ছে। তা কাজে লাগছে কিভাবে?

গুজরাটের নিয়মটা এবিষয়ে খুব স্পষ্ট। রাজ্যে মাদ্রাসা-শিক্ষার জন্য এখানে আলাদা করে কোনো বোর্ড নেই। এখানে দু'ধরনের মাদ্রাসা চলে। প্রথমত, এক ধরনের মাদ্রাসায় স্রেফ ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, আরেক ধরনের মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই দ্বিতীয়োক্ত মাদ্রাসার জন্যই সরকারের অনুমতি প্রয়োজন। যে সব মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না গুজরাট সরকার। যে মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষামুক্ত আধুনিক বিষয় পড়ানো হয়। তাদের মূলস্রোতে আনতে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের সঙ্গে তা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই গুজরাটের অধিকাংশ মাদ্রাসাকেই গণিত কিংবা ইংরেজির মতো যুগোপযোগী বিষয় পড়ানো হয়। গুজরাট সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় মাদ্রাসার মাধ্যমে মৌলবাদ প্রসারের উদ্যোগে ঠেকানো গিয়েছে।

শিক্ষা-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিষয়টি এমনই হওয়া উচিত। মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে জঙ্গি যোগের কথা তাঁরা বাদ-ই দিচ্ছেন, তা সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষা বলে স্বতন্ত্র কিছুর পক্ষপাতী নন অধিকাংশ শিক্ষাবিদ-ই। মূলধারার সঙ্গে মাদ্রাসাকে মেলাতে না পারলে এধরনের শিক্ষা-পদ্ধতির যৌক্তিকতা নেই বলেই তাঁরা মনে করছেন। অন্যদিকে বাংলা কিংবা অসমের সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাগুলিতে দেশবিরোধী কাজকর্ম কীভাবে চলে তা অধিকাংশ মানুষেরই জানা। তবুও স্রেফ ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলি ব্যাঙের ছাতার মতো মাদ্রাসা তৈরির অনুমতি দিয়ে চলেছে। সেই মাদ্রাসাগুলির পাঠক্রম, পাঠ্যসূচির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই সরকারের নেই।

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসম প্রভৃতি রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক বোর্ড থাকলেও কোনো পাঠ্যসূচিরই বালাই নেই। অঙ্ক শেখানো হচ্ছে, না বন্দুক ধরতে শেখানো হচ্ছে তার নজরদারির কোনো ব্যবস্থা নেই। সব মাদ্রাসাই খারাপ, এমন দাবি কেউই করছেন না, তবে ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাবেই। রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীরাও সংখ্যালঘু ভোটের স্বার্থে অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন। মহারাষ্ট্র সরকারের এ সংক্রান্ত ঘোষণাটি এই বিষয়টিকে ফের স্পষ্ট করল। ■

ব্রিটেনে জনসংখ্যার দৌড়ে এগিয়ে ভারতীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সমগ্র বিশ্বে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্প এমনকী জনসংখ্যার দিক থেকেও এগিয়ে চলেছে ভারতীয়রা। প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে বৃটেনে বসবাসকারী বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় অবস্থান করছে ভারতীয়রা। ২০০৪ সালে বৃটেনজাত শিশুদের মধ্যে ৫২.৫৮ লক্ষ ছিল বিদেশি যেখানে বৃটিশ শিশুর সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ। কিন্তু মাত্র ন' বছরের মধ্যেই অভিবাসীজাত শিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৯.২১ লক্ষ এবং বৃটিশ শিশুর সংখ্যা ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ। বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত জনতত্ত্ববিদ ডেভিড কোলেম্যান জানিয়েছেন, এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ২০৭০ সালের মধ্যেই ব্রিটিশরা নিজেদের দেশেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যাবে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে বাগডোগরা বিমানঘাঁটির নামকরণের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পশ্চিমবঙ্গের বাগডোগরা বিমানঘাঁটি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করার দাবি জানাল রাজ্য বিজেপি। গত ৪ জুলাই কেন্দ্রীয় নগর বিমান পরিবহন মন্ত্রী পি গজপতি রাজুর কাছে এই মর্মে এক স্মারক পত্র তুলে দেন সাংসদ তরুণ বিজয়-এর নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপি-র একটি প্রতিনিধি দল। তরুণ বিজয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানান ভারতের জাতীয়তাবাদী মানুষ, বিশেষত বিজেপি-র সঙ্গে যুক্ত মানুষরা, মহান দেশপ্রেমিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামানুসারে বাগডোগরা বিমানঘাঁটির নামকরণের দাবি জানাচ্ছে। জাতীয় ঐক্যের জন্য ড. মুখার্জী আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। তাঁর এই সাধনা ও তপস্যাকে যাতে আমরা না ভুলে যাই, তার জন্যও এই নামকরণ দরকার।

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১১৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৬ জুলাই কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়) রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল রাম নায়েক, ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল বলরামদাস ট্যাণ্ডন ও ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় প্রমুখ।

প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন উদ্ধারে সরকারের তৎপরতা আশাব্যঞ্জক নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান হলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। অথচ সরকারি উদাসীনতায় বছরের পর বছর লুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের এই অমূল্য সম্পদগুলি। ২০১১ সালে ইউনেস্কো থেকে প্রাপ্ত হিসাবানুযায়ী ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ভারত থেকে লুণ্ঠিত হয়েছে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী। যদিও নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই অবস্থার সামান্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ভারতবর্ষ থেকে চুরি হয়ে যাওয়া একটি বিখ্যাত নটরাজের মূর্তি। এর ঠিক এক বছর আগে ২০১৩ সালে মার্টিন ব্রিস্ফ নামে একজন ফরাসি ১ হাজার ১০০ বছর পূর্বের বৃষাননা যোগিনী মূর্তিটি ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু যে পরিমাণ অমূল্য মূর্তি পাচার হয়েছে তার তুলনায় পুনরায় প্রাপ্ত মূর্তির সংখ্যা খুবই কম। চুরি হয়ে যাওয়া মূর্তিগুলি নিয়ে সরকারি স্তরেও সেরকম কোনো পরিসংখ্যান নেই। মূর্তি চুরি যাওয়ার পর এ এস আই তার কর্তব্যকর্ম পালনের জন্য পুলিশের কাছে এফ আই আর করেই খালাস। এরপর সেই বিষয়টির অনুসন্ধান করা বা জাতীয় পরিসংখ্যান তৈরিতে কোনো ভূমিকাই তারা পালন করেনি। তবে প্রশংসনীয় বিষয় এই যে চুরি হয়ে যাওয়া মূর্তিগুলোর অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র তামিলনাড়ু প্রতীপ ফিলিপের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করেছে। এছাড়া ২০০৭-এ পাঁচ লক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গঠিত 'দ্য ন্যাশনাল মিশন অন মনুমেন্টস অ্যান্ড অ্যান্টিক্যুইটিস'-এর কাজকর্ম শোচনীয়।

বৃষাননা যোগনী মূর্তি।

সমগ্র বিশ্বে তৃতীয়স্থানে থাকা 'Smuggling of Cultural Heritage' নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছেন 'প্লানডার্ড পাস্ট' (ওয়েবসাইট), 'পোয়েট্রি ইন স্টোন' (ব্লগ)-এর প্রতিষ্ঠাতা এস বিজয় কুমার-সহ দেশ, বিদেশের বিদ্বজ্জনেরা। মূর্তি পাচারের এই রমরমা আটকাতে এ এস আই অ্যান্টিক্যুইটিস অফ ১৯৭২ আইনটিকে সংশোধিত করার কথা ভাবছে। উল্লেখ্য, ভারত থেকে পাচার হওয়া অমূল্য মূর্তির বেশিরভাগ গন্তব্যস্থল হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। প্রসঙ্গক্রমে তিনটি বিখ্যাত মূর্তির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি সম্পর্কে ভারত সরকার আগ্রহ না দেখানোয় এদেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে নির্মিত ভারহুত মূর্তি। এই মূর্তিটি পাওয়া যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একজন আর্ট ডিলার সুভাষ কাপুরের থেকে যিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির অধীনে থাকা এই মূর্তিটি ভারতকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এ বিষয়েও ভারত সরকার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। দ্বিতীয় হচ্ছে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী মূর্তি। এটি গুজরাটের ওপেন-এয়ার মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়। যথারীতি এফ আই আর হয় এবং এর পাঁচ বছর পরে ২০০৬-এ লন্ডন আর্ট উইকে প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় মূর্তিটি হলো সিঙ্গাপুরের 'এশিয়ান সিভিলাইজেশন মিউজিয়ামে প্রদর্শিত উমা পরমেশ্বরী। সবক্ষেত্রেই উদাসীনতা বিদ্যমান।

ডোনা ইয়েট্স নাম্নী ল্যাটিন আমেরিকার পাচার হয়ে যাওয়া মূর্তি নিয়ে অধ্যয়নকারী এক প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেছেন যে পাশ্চাত্যের 'এশিয়ান আর্ট' মিউজিয়ামে গেলে দেখা যাবে, সেখানে প্রদর্শিত বেশিরভাগ নিদর্শনই ভারতীয়। তবে চোরাচালানকারীর সংখ্যা শুধু ভারতেই নয়, এশিয়ার অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান। বিখ্যাত ক্রিমিনোলজিক্যাল ট্র্যাফিকিং নেটওয়ার্কিং অ্যানালাইজার সিমন ম্যাকেঞ্জি, টেস ডেভিস অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে দেখেছেন যে কম্বোডিয়া থেকেও হিন্দু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাচার হয়। আর এভাবেই প্রবঞ্চনা, মধ্যস্থতাকারী দালালদের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমেই বিদেশের বিভিন্ন গ্যালারীতে পৌঁছে যাচ্ছে ভারতের অনন্য সুন্দর শতাব্দী প্রাচীন ভাস্কর্য।

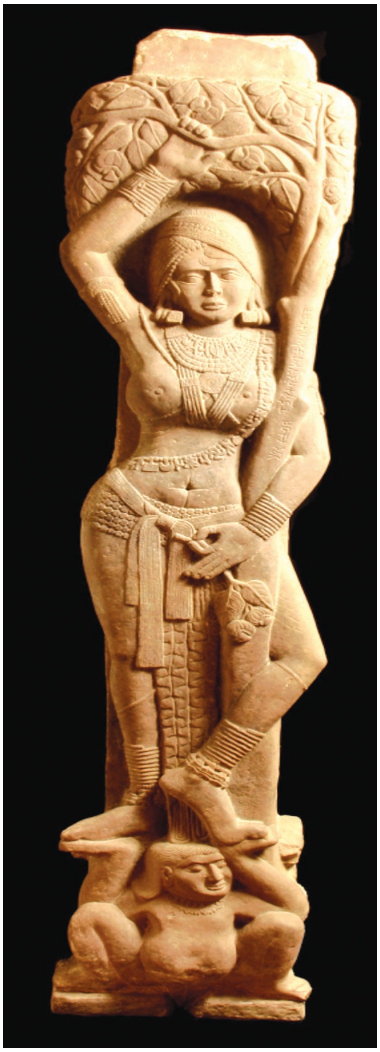

ভারহুতি মূর্তি

দেশে দ্বিতীয় মুসলমান জনবহুল রাজ্য অসম

সংবাদদাতা॥ গত ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১১ সালের লোকগণনার তথ্য প্রকাশ করেন। যেখানে দেখা গেছে অসমে মুসলমান জনসংখ্যার হার ক্রমবর্ধমান। এমনকি দেশের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরের পরেই রয়েছে অসম। পাশাপাশি মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারে পশ্চিমবঙ্গের নাম তারপরই। দেশের তিনটি রাজ্য জম্মু-কাশ্মীর, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা যথাক্রমে ৬৮.৩, ৩৪.২ এবং ২৭ শতাংশ। অর্থাৎ মুসলমান জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে জম্মু-কাশ্মীরের পর সর্বাধিক মুসলমান বসতিপ্রধান রাজ্য হতে চলেছে অসম।

২০১১ সালের জনগণনা ভিত্তিক দেখা যাচ্ছে অসমে এই মুসলমান বৃদ্ধি আগের তুলনায় ৩.৩ শতাংশ বেড়েছে। পূর্বে অসমে মুসলমান জনসংখ্যার হার ছিল ৩০.৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও সংখ্যাটা ঊর্ধ্বমুখী। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার হার ছিল ২৫.২ শতাংশ। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ১.৮ শতাংশ বেড়েছে। জাতীয় জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ২৪ শতাংশ। এই বৃদ্ধির পিছনে নানা কারণ উঠে আসছে। তার অন্যতম কারণ হলো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বিশাল মাত্রায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির এটি একটি প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

আসানসোলে গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন অনুপ্রবেশ রুখতে হবে। সে সময় একথাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বিরোধী নেতা-নেত্রীরা। তিনি সেসময় আঁচ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান মুসলমান বৃদ্ধির পিছনে বাংলাদেশি মুসলমানদের হাত রয়েছে। এবার

অসমে জাতিভিত্তিক লোকগণনার তথ্য প্রকাশ

- জাতীয় জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধি ১৮ শতাংশ। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২৪ শতাংশ।
- অসমের গত দশকে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩৪.২ শতাংশ। জাতীয় স্তরে বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.২ শতাংশ।
- ১.১১ শতাংশ মানুষ সরকারি কর্মচারী।
- গ্রামীণ এলাকার ১১ শতাংশ আছে ফ্রিজ।
- মাত্র ৪.৬ শতাংশ মানুষ আয়কর দেন।

জনসংখ্যার তথ্যে যে সংখ্যা উঠে এসেছে তা দেখে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের অনুমান স্বভাবতই ভিত্তিহীন নয় বলেই ধরে নিতে হবে। অসম-পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার গ্রাফ উপরের দিকে উঠলেও পার্শ্ববর্তী রাজ্য মেঘালয়, ওড়িশা এবং অরুণাচল প্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ০.০১ শতাংশ। তবে উত্তরাখণ্ডে তা নতুন করে বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে ১৩.৯ শতাংশ মুসলমান। আগামী দিনে এই হার আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তান সীমান্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি আরও কঠোর না হলে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ জাতীয় স্তরে মুসলমান বৃদ্ধির হার ১৪.২ শতাংশ। এবার রাজ্যগুলিতেও তুলনামূলকভাবে সেই হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলমান রাজ্য হিসাবে হিটলিস্টে অসম-পশ্চিমবঙ্গ স্থান করলেও অনুসূচিত জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের তথ্যও উঠে এল। এই প্রথমবার জাতিভিত্তিক লোকগণনার তথ্য প্রকাশ করা হলো, তাতে দেশের সবকটি প্রান্তের ছবি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত এই লোকগণনার তথ্য অনুযায়ী দেশের গ্রামাঞ্চলে অনুসূচিত জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের পরিবারের সংখ্যা ২৯.৪৩ শতাংশ। এক্ষেত্রে পাঞ্জাব এগিয়ে। পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে ৩৬.৭৪ শতাংশ লোকই অনুসূচিত সম্প্রদায়ের। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু। অনুসূচিত জনজাতির লোকের সংখ্যার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে মিজোরাম। এই রাজ্যে মোট জনসংখ্যার ৯৮.৭৯ শতাংশই অনুসূচিত জনজাতি। মিজোরামের পর রয়েছে লাক্ষাদ্বীপ এবং নাগারাজ্য। তবে শুধু লোকগণনার তথ্যই এদিন প্রকাশিত হয়নি। সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চল এবং শহরগুলিতে কত শতাংশ মানুষ বাইক, সাইকেল, রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করে সেই তথ্য যেমন উঠে এসেছে তেমনি আয়কর দাতাদের হারও তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে। দেশের মাত্র ৪.৬ শতাংশ মানুষ আয়কর দেন। তবে এই চিন্তা যত না ভাবাচ্ছে সরকারকে তার চেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে দুই রাজ্যে মুসলমান বৃদ্ধি। মুসলমান বৃদ্ধি নিয়ে দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক দপ্তরগুলি ঘনিষ্ঠমহলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

নেহরুর মুসলমান তোষণ নীতির ফল আজও ভারতবাসীকে ভুগতে হচ্ছে কাশ্মীরে

বাঙালি হিন্দু কী ভারত গৌরব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিস্মৃত হয়েছে? সেটাই স্বাভাবিক। বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। শ্যামাপ্রসাদ বাধা না দিলে কলকাতা-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেত। জওহরলালের এমনই পরিকল্পনা ছিল। নেহরুর বাঙালি বিদ্বেষ কতটা ছিল তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নেহরু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কোনো বাঙালি নেতাকে সহ্য করতে পারেননি। বাঙালি হিন্দু এখন আন্তর্জাতিক হয়েছে। তাই শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও সংগ্রাম পাঠ্য পুস্তকে থাকে না। স্বস্তিকা পত্রিকা ছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত অন্য কোনো পত্রিকায় শ্যামাপ্রসাদ অনুপস্থিত থাকেন।

ভারত তথা হিন্দুর গৌরব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়। ৬ জুলাই ১৯০১ সালে। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পিতা। জননী যোগমায়া দেবী। শ্যামাপ্রসাদ অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। পরে পিতার আদেশে বাংলা সাহিত্য নিয়ে এমএ পড়েন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনের স্নাতক হন। এই বছরেই শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেন। এরপর ১৯২৬ সালে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য ইংল্যান্ড যান এবং সসম্মানে বার এট ল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ১৯৩৪ সালে শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে মনোনীত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তিনি তরুণতম উপাচার্য। এই রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেননি। শ্যামাপ্রসাদের একান্ত অনুরোধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলায় দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটিও একটি রেকর্ড। কারণ, দীক্ষান্ত ভাষণ ইংরেজিতে দেওয়াই প্রথা। আজও সেই প্রথা চলছে। কেন, আমার জানা নেই। সম্ভবত, বাঙালির সাহেব প্রীতি এর কারণ।

গূঢ় পুরুষের কলম

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর। এই সময় তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। পরে কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ নীতির বিরোধিতায় কংগ্রেস দল ত্যাগ করে নির্দল প্রার্থী হয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৪১-৪২ সালে শ্যামাপ্রসাদ অখণ্ড বাংলার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তখন ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি এবং সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লীগের হিন্দু বিরোধিতা সহ্য করেননি। প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। এই ঘটনা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তন আনে। তিনি বুঝতে পারেন যে হিন্দু হয়ে হিন্দুর স্বার্থরক্ষা করতে না পারলে সমগ্র বাংলার শাসন ক্ষমতা মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে চলে যাবে। তাই হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় ১৯৪৪ সালে তিনি 'হিন্দু মহাসভা'র সভাপতি হন। এই সময় পাকিস্তানের দাবিতে এবং মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ মদতে নোয়াখালিতে নৃশংসভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা করা হয়। লীগের এই গণহত্যা সারা দেশকে স্তম্ভিত করে। এই ঘটনা শ্যামাপ্রসাদের চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করে। এতকাল তিনি ভারত ভাগের তীব্র প্রতিবাদ করে এসেছেন। নোয়াখালির হিন্দু নিধনের ঘটনায় শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পারেন যে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুর সহাবস্থান সম্ভব নয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বুঝেছিলেন হিন্দুর স্বার্থ একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই রক্ষা করতে পারে। সঙ্ঘের সহায়তায় শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর ভারতীয় জনসঙ্ঘ দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই নবগঠিত দলের তিনজন প্রার্থী লোকসভায় নির্বাচিত হন। এই তিন প্রার্থীর একজন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শ্যামাপ্রসাদের জনসঙ্ঘ জন্মলগ্ন থেকেই নেহরুর মুসলমান তোষণ নীতির বিরোধিতা করেছে। তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল মুসলমান গরিষ্ঠ কাশ্মীরকে 'স্পেশাল স্ট্যাটাস' দেওয়ার। সংবিধানের ৩৭০ নং ধারার অন্যায় সুযোগ নিয়ে নেহরু এই কাজটি করেন। নেহরুর মুসলমান তোষণ নীতির বিষবৃক্ষের ফল আজও কাশ্মীরে ভারতবাসী পাচ্ছেন। কাশ্মীরে হিন্দু নিরাপদ নয়। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবিতে ১৯৫৩ সালের ১১ মে শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। জেলবন্দি থাকাকালে বিষ ইঞ্জেকসন দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়। কোনোদিনই তাঁর মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি। শ্যামাপ্রসাদের অকাল প্রয়াণ ঘটে ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন। ■

কর্মখালি : দলদাস উপাচার্য চাই

সুরঞ্জন দাস
মাননীয় উপাচার্য
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

স্যার, অপরাধ নেবেন না প্লিজ। সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষকদের সম্পর্কে কটু কথা বলার শিক্ষা পাইনি। সমালোচনাও নয়। কিন্তু যে শিক্ষা পেয়েছি তাতে সাম্প্রতিক যে ঘটনাটি ঘটল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারপর কিছু না বলাটা আমার শিক্ষাদীক্ষা নিয়েই প্রশ্ন তুলবে। আপনার কাছে স্যার আমার প্রথম প্রশ্ন— উপাচার্য পদাধিকারী কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর আজ্ঞাবহ কর্মী? বরং রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল মশাইকে তাঁর ঊর্ধ্বতন বলা যেতে পারে। কিন্তু আপনি সেদিন দেখলাম শুনলাম বলছেন, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি মানে 'রিপোর্ট' না দিয়ে আপনি নাকি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না। কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে তৃণমূলীদের স্পষ্ট তাণ্ডবের পর আপনার এই মন্তব্য স্যার শুধু আপনার সম্মান নষ্ট করেনি বরং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাও মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

স্যার, বাম আমল থেকেই এই রাজ্যে উপাচার্য পদটি প্রহসনের বস্তু হয়ে গেছে। এবার আপনি যেন সেই প্রহসনকে স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। উপাচার্য হিসেবে নিজেই বুঝিয়ে দিলেন বিকাশভবনের দাস না হলে এই পদের যোগ্য হওয়া যায় না। এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে শতাধিক বছরের প্রাচীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিছকই একটা সরকারি দপ্তর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে আপনি যখন সমাসীন হন, তখন মহাকরণে বামফ্রন্ট সরকার। এখন নবান্নে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। শহরের রঙ লাল থেকে নীল-সাদা হয়েছে। ক্যালেন্ডারের অনেক পাতা উল্টেছে। কিন্তু স্যার আপনি ক্যালেন্ডারের ২০০৮ খৃষ্টাব্দ, আর ২০১৫ খৃষ্টাব্দকে এক করে দিয়েছেন। তখনও আপনি সরকার পক্ষের নয়নমণি ছিলেন, এখনও তাই আছেন। দ্বারভাঙ্গা ভবনের বড় চেয়ারটি তাই আপনাকে হারাতে হয়নি। আসলে রাজনীতিকরাই এই নিয়ম চালু করেছেন। একদিন অনিল বিশ্বাস করেছিলেন আজ শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন। আর তাঁর শিকার হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্র। আপনি ইতিহাসের কৃতী ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষক। আপনি এবার নতুন ইতিহাস তৈরি করলেন। না, তৈরি নয়, ইতিহাস তৈরিই ছিল। সকলেই ওই মহান পদটি যে সরকারের ভালো-লাগা, খারাপ-লাগায় চলে তা জানত। আপনি শুধু সেই ইতিহাসে সরকারি সিলমোহর লাগিয়ে দিলেন। এই 'গায়ের জোর' রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মানে তাঁর বকলমে মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে ভালোই পারেন। এর আগে রামপুরহাট থেকে যাদবপুর কিংবা প্রেসিডেন্সি কলেজ সর্বত্রই তারা দেখিয়ে দিয়েছেন শিক্ষাঙ্গনে গুণ্ডা পাঠানোতেও তাদের বিন্দুমাত্র সময় লাগে না। এবং সবকিছুকে ধামাচাপা দেওয়াতেও তারা পাকা খেলোয়াড়। শিক্ষকদের এলোপাথাড়ি মার খেতে দেখল গোটা রাজ্য আর শিক্ষামন্ত্রী মানে সরকারের প্রশ্ন, 'শিক্ষকরা কেন আন্দোলন করবেন?' একসময় তাঁদের সর্বময় নেত্রীর অনেক অন্যায় আন্দোলনের সময় বাম সরকার বাধা দিলে তারাই রে রে করে উঠতেন। যুক্তিগত ভাবেই রাজ্যবাসীও সেইসব পুলিশি হামলার নিন্দা করেছে। সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর সমালোচনা করেছে। অনেক সময় নেতানেত্রীদের আক্রান্ত হওয়ার অভিনয় দেখেও রাজ্যবাসী এত চোখের জল ফেলেছে যে মনে হয়েছে জল সরাতে ওয়াইপার লাগাতে হবে। সেইসব জলে ভরসা করেই আজ তাঁর ক্ষমতায় সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন শিক্ষামন্ত্রী। আন্দোলনের দাবি যাই হোক, অধ্যাপকদের আন্দোলন ছিল নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ এবং আগাম অনুমতি নেওয়া। তাহলে কোন অধিকারে ছাত্র সেজে বহিরাগতরা আক্রমণ চালালো সেই প্রশ্নই তো একমাত্র ওঠা উচিত।

এই রাজ্যের নেতা ও মন্ত্রীরা তো রাজনীতির স্বার্থ আর দলীয় লাভ-লোকসানের হিসেবেই ব্যস্ত। তাই তারা জয়ের অঙ্ক পাকা করতে রাজ্যের বারোটা বাজাতে দ্বিধা করছেন না। কিন্তু উপাচার্যমশাই আপনি তো সত্যের পক্ষেই থাকতে পারতেন। আপনিও তো শিক্ষক। শিক্ষকদের আক্রমণ হজম করতে আপনার বিবেক নিশ্চয়ই চায়নি! তবুও দাদা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুধুই 'উত্তেজনা' দেখলেন। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অসহায়তা দেখলেন না। এমনকী ছাত্রদের হাতে ঠেলা খেয়েও বললেন 'ও কিছু না'। কিন্তু স্যার আপনি লাঞ্ছিত হননি, সেদিন লাঞ্ছিত হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর নাম 'সুরঞ্জন দাস' কি 'দল দাস' সেকথা ইতিহাস মনে রাখবে না। সত্যিই আপনি ইতিহাসের দাগ রেখে গেলেন।

আপনাকে দেখে ছাত্রসমাজ একটা
বড় জিনিস শিখবে...
শাসকদের অসন্তোষ উৎপাদন
করলে বড় হওয়া যায় না।

— **সুন্দর মৌলিক**

স্বৈরতন্ত্রের অবসান

ভারত ইতিহাসের এক অবাঞ্ছিত অধ্যায়ের অবসান হইল। ক্ষমতা কেন্দ্রিকরণের পরিসমাপ্তি। বিস্তৃত আর্যাবর্তের সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে উত্থিত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সম্মিলিত রোষনিঃশ্বাসে একনায়কতন্ত্রের দুর্গপ্রাকার ভঙ্গুর তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পরিয়াছে। ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তিঃ !

ক্ষমতার ক্ষুধা বহু দেশের বহু রাষ্ট্রনায়কে উন্মাদ করিয়াছে। ইতিহাস বলে, ক্ষমতাপ্রিয় একনায়কতন্ত্রের পথাশ্রয়ীদের ক্ষমতার ক্ষুধার শেষ নাই, মোহভঙ্গ হইতেই চায় না।

একদা ইহাই দেখা গিয়াছে যে, প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনী যতক্ষণ না দুয়ার অতিক্রম করিয়াছে ততক্ষণ ভূগর্ভ আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়াও হিটলার ফুরারগিরির স্বপ্ন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর ১৯৭৫ সালে যে ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল— আজ ১৯৭৭ সালের মার্চ যখন এই নিবন্ধ লেখা হইতেছে তখন নির্বাচনে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর তাঁহাকে সেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

পদত্যাগ কথা অবান্তর, জনতার রায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি সদলবলে বরখাস্ত হইয়াছেন। বিপুল সাফল্যের মাধ্যমে বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছে জনতা পার্টি। নবাগত শক্তিশালী দলের যিনি নূতন সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন তিনি হইলেন আজ জনতা নির্বাচিত দেশের নূতন কর্ণধার— প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই।

কংগ্রেস আজ বহুধা বিভক্ত, বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভাঙিয়াছে এবং এখনো ভাঙিতেছে।

যতই হোক, ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানটির একটি বিশেষ স্থান ছিল। ইন্দিরা গান্ধী নিজ স্বার্থে তাহাকে কলুষিত করিয়াছেন। নিজের ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে তাহাকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিয়াছেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের বকলমে বশংবদগোষ্ঠী দ্বারা নিজ ক্ষমতাধিকারের স্বার্থে সমগ্র শাসনযন্ত্রকে প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন।

অন্তবর্তীকালের মধ্যে তিনি করেন নাই কী ? আদালতের অধিকার— নাগরিক জীবনের মৌলিক অধিকার— সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া জাতীয়তাবোধসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও বিরোধী নেতাদের নিপীড়ন ও গ্রেফতার করিয়া বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সমগ্র দেশকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শাসনতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ইন্দিরা গান্ধী সেবাদলে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হঠাৎ নির্বাচন ডাকিয়া তিনি তামাম বিরোধী দলকে অপ্রস্তুত ও বিপর্যস্ত করিয়া এই ক্ষমতাধিকারের চমৎকার পরিকল্পনাও করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হায় ! সবই বৃথা। জনমানস জন্ম সম্ভব করিয়াছে জনতা দলের। জনতাদল ভারতীয় জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। তাহার শক্তি যে কতখানি জনমতের রায়ে প্রতিফলিত হইয়াছে। জনতার জয়যাত্রা একনায়কতন্ত্রের সকল দুরভিসন্ধি ধূলিসাৎ করিয়াছে। সূচনা করিয়াছে নূতন ইতিহাস।

সমগ্র বিশ্ব আজ অবাক হইয়া ভারতের দিকে তাকাইয়া আছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াটার গেট ব্যাপারে নিক্সন অপসারণ একদা চমকিত করিয়াছিল। নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।

ভারত আবার প্রমাণ করিয়াছে যে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা তাহার পরম্পরাগত।

(সম্পাদকীয়, ২৮ মার্চ, ১৯৭৭)

আতঙ্কের একুশ মাস

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

অতি সম্প্রতি ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থার ৪০ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। সেইসব দিনগুলির কথা আজকের রাজনীতিতে আর প্রায় আলোচনাই হয় না বলে, নতুন প্রজন্মের অনেকে এই বিষয়টার সঙ্গে বিশেষ একটা পরিচিত নয়। তাছাড়া জরুরি অবস্থার নেত্রী বহুদিন হলো গত হয়েছেন, আর তাঁর উত্তরপুরুষরা আজ রাজ্যপাট হারিয়ে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক। সে কারণে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের কলঙ্কতম অধ্যায়টি কেমন যেন বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাচ্ছে। অনেকের আবার বাপ-ঠাকুরদার মুখ থেকে শুনে সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ভাসা ভাসা ধারণা হয়েছে। তবে যাঁরা সেইসব আতঙ্কের দিনগুলির স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন, জরুরি অবস্থা ও মিসা'র নাম শুনলে আজও তাঁদের গায়ের রোম খাঁড়া হয়ে ওঠে।

নেহরু জমানাকে প্রাণপণে আগলে রাখতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাঁটা কোনোকালে দেখা যায়নি। যেসময় সোনিয়া-রাহুল মিলে দলটাকে পুরোপুরি থেঁতলে দিয়ে, চূড়ান্ত অসম্মানের সঙ্গে গঙ্গাপ্রাপ্তির দিকে নিয়ে চলেছেন, সে সময়ও তাঁরা এই পরিবারটির কাছে তাঁদের দাসত্বকে প্রাণপণে প্রমাণ করতে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দশকের পর দশক ধরে এই ছবিটা পাল্টায়নি। এইসব নেতাদের মতোই মেরুদণ্ডহীন অবস্থা হলো এই রাজপরিবারটির উচ্ছিষ্টভোজী উত্তরপুরুষদের। সামান্যতম সুযোগ পেলেই হলো! একেবারে নতজানু হয়ে পরিবারের বেদীমূলে বসে পড়ে বশংবদতা প্রমাণ করতে লেগে পড়ে। তাই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত, এই পরিবার মানেই কংগ্রেস, আর কংগ্রেস মানেই এই পরিবার। সেদিনের সঙ্গে আজকের কংগ্রেসের কী অসম্ভব রকমের মিল। সেদিন দল তথা সরকারের ভরকেন্দ্রে ছিল মা-ছেলে (ইন্দিরা- সঞ্জয়), আজও দলের ভরকেন্দ্রে মা-ছেলে (সোনিয়া-রাহুল), যেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দলটার সংস্কৃতি বিগত সাত দশকে একটুও পাল্টায়নি। এ সংস্কৃতি আর যাই হোক, গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না। স্বাধীনতার প্রথম সকাল থেকে ২৮ বছর ধরে একটানা বাপ-বেটিতে মিলে রাজ করার পরও এমন কি ঘটল যে ইন্দিরা গান্ধীকে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করতে হলো?

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই (জরুরি অবস্থার) ইন্দিরা সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশে অসন্তোষ-বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করে। নেতৃত্ব দেন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি সমস্ত কংগ্রেস- বিরোধী অ-কমিউনিস্ট দলগুলিকে এক হয়ে কংগ্রেসের মোকাবিলা করতে আহ্বান জানান। বিহারকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে যোগদান করেন দেশের আপামর জনগণ। ছাত্র-যুবকদের আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদানে কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রমাদ গোনে। ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি সময়ে গুজরাট নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যায়। সে মাসেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরার নির্বাচন দুর্নীতির জন্য অবৈধ ঘোষিত হলো। শুধু তাই নয়, সমস্ত সাংবিধানিক পদ ও নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকারও তিনি ৬ বছরের জন্য হারালেন। বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে তাঁর পদত্যাগ চাইলেন। এদিকে ২৫ জুন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিশাল জনসমাবেশ দেশব্যাপী উত্তাল আন্দোলনের রূপ ধারণ করল। এক কথায় প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে সাংবিধানিক পদ সবকিছুই তিনি হারাতে বসলেন। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিকরা যে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়তে চান না! তাই অবধারিতভাবেই সেইদিনই মাঝরাতে কতিপয় তোষামুদে কংগ্রেসী নেতার পরামর্শে তিনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে বসলেন।

এমন কথা শোনা যায় যে, হিটলারের এক চাটুকার একসময় বলেছিলেন যে হিটলার মানেই জার্মানি, আর জার্মানি মানেই হিটলার। আর জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বরুয়া ইন্দিরার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রমাণ করতে একই সুরে বলেছিলেন যে, ইন্দিরা মানেই ভারত, ভারত মানেই ইন্দিরা। ভারতীয় সংবিধানস্বীকৃত জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করে ইন্দিরা গান্ধীর গণতন্ত্রকে আক্রমণের ইতিহাসকে স্মরণ করতে গিয়ে বছর কয়েক আগে এক প্রখ্যাত সমালোচক কটাক্ষ করেন যে, হিটলার ছিলেন ইন্দিরা, ইন্দিরা ছিলেন

হিটলার। জরুরি অবস্থায় হিটলার আর ইন্দিরার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেই তিনি এমন একটা মন্তব্য করেন।

(১) হিটলারের মতো ইন্দিরাও সংবিধানের একটি বিশেষ সংস্থানকে অপব্যবহার করে জরুরি অবস্থা জারি করেন।

REGD. NO. H/SD-23

INDIAN HERALD

NATIONAL ENGLISH DAILY

Founder & Editor: THAKUR V. HARI PRASAD

SPECIAL SUPPLEMENT

2 Pages HYDERABAD, Thursday, June 26, 1975 PRICE 15 Paise

EMERGENCY DECLARED
JP, Morarji, Advani, Asoka Mehta & Vajpayee arrested

NEW DELHI June 26. The President has declared a state of emergency threatening the security of India "due to internal disturbances".

The emergency declared in 1971 and still in force relates to threat to the security of India from external aggression.

The President signed the order declaring the emergency at about seven this morning.

Earlier the Cabinet met at six a.m and considered the situation and approved the recommendation to the President for the declaration of emergency.

NEW DELHI: Mr Jayaprakash Narayan was taken into police custody early this morning from the Gandhi Peace Foundation where he ...

... morning flight.

According to the Superintendent of the central district police Mr R K Ohri Mr Narayan was detained under the Maintenance of Internal Security Act (MISA) warrants for his arrest were issued by the Deputy Commissioner of Delhi Mr Sushil Kumar. It is learnt that warrants for arrest against many leaders of non-CPI opposition parties have also been issued.

NEW DELHI June 26. Mr Morarji Desai was allowed to have his bath and perform "puja" before police officers took him into custody shortly after 2 a.m. His clothes were packed in advance and kept in a waiting taxi.

When the police party reached his house and informed him that he was being taken into custody under the Maintenance of Internal Security Act Mr Desai said he would like to go to toilet and have his bath. The police party agreed and later Mr Desai performed his prayers before boarding the waiting taxi.

Mr Asoka Mehta President of Congress (O) has also been arrested. He was picked up from his house at 6-45 a.m according to a member of his household.

BANGALORE: Mr L K Advani ... a meeting of the Parliamentary Consultative Committee.

According to reports from various Haryana districts the State police swung into action in the small hours of this morning and arrested a number of Opposition leaders including two Jana Sangh MLA's.

CHANDIGARH: Over 35 top Opposition leaders most of them belonging to the Jana Sangh and the Socialist Party were arrested early today by the Punjab police from throughout the State under the MISA according to an official source here.

The Haryana Government this morning arrested 'Daily Tribune's' staff correspondent in Hissar ... under the MISA.

Raj Narain, Mody & Chandra Sekhar held

NEW DELHI June 26. Mr ...

২৬ জুন, ১৯৭৫-এ প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড।

(২) হিটলারের পথেই সেন্সরশিপ্ চালু করে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হত্যা করেছিলেন।

(৩) হিটলারের মতোই হুবহু তাঁরও ২৫ দফা কর্মসূচি ছিল।

(৪) নাৎসি গুণ্ডাবাহিনীর মতো তাঁর ও যুব কংগ্রেস নামে খুনে দুর্বৃত্ত বাহিনী ছিল।

(৫) শোনা যায় যে, হিটলারের জার্মানির মতো ইন্দিরার ভারতেও নাকি ট্রেন সঠিক সময়ে চলতো, যাতে সরকার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে যে দেশ এগিয়ে চলছে!

জরুরি অবস্থার ভয়ঙ্কর সেই ২১ মাসে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, অকথ্য নিষ্ঠুরতা, প্রায় সমস্ত বিরোধীদলের লোকেদের নির্বিচারে জেলে পোরা থেকে শুরু করে সরকারের সমালোচক যাদের অধিকাংশই সাংবাদিক ছিলেন তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়া, ভারতীয় সংবিধানকে ধ্বংস করে নিজেকে দলের ঊর্ধ্বে এবং কংগ্রেসকে দেশের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দিরাকে সরাসরি হিটলারের সঙ্গে তুলনা করাটা বোধ হয় যথাযথ হবে না। কেননা হিটলারের পথে নর-নারী-শিশুদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করার মতো নৃশংসতা প্রদর্শনে ইন্দিরা হয়তো কিছুটা হলেও পিছিয়ে ছিলেন। সেসময় একটা অবাক করা স্লোগান চালু হলো— 'কথা কম, কাজ বেশি'। ততোধিক অবাক করা আরও দু'টি স্লোগান দেশময় চালু হলো। (১) গান্ধীবাদী ভূদান আন্দোলনের নেতা আচার্য বিনোবা ভাবেকে উৎসর্গ করে পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড প্রভৃতির উপর ছেপে দেওয়া হলো--- 'জরুরি অবস্থা নিয়মানুবর্তিতার এক অধ্যায়'।

(২) 'নেতৃত্ব যথার্থ, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল'। এসব প্রচার করে কখনোই প্রমাণ করা যায়নি যে জরুরি অবস্থা নিয়ে জনগণের কোনো মাথাব্যথা ছিল না বা মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল। মৌলিক অধিকারগুলিকে খর্ব করে, বশংবদ বিচারকদের নিয়োগ করে দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে বগলদাবা করে রাখা হয়েছিল। জনস্বার্থ মামলায় আদালতে পেশ করা হবে বা নানা ছুতো-নাতায় মাঝরাতে হঠাৎ দরজায় কড়া নেড়ে পুলিশের তুলে নিয়ে যাবার পর, সেইসব লোকেদের বেমালুম বেপাত্তা হয়ে যাবার মতো ঘটনার অদ্ভুত এক আতঙ্ক যেন মানুষজনকে গ্রাস করেছিল। বিভিন্ন সমাজকর্মীরা বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেসব খারিজ হয়ে যায়। মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের অধিকারকেও খর্ব করার সরকারি নীতিকে দেশের চারজন প্রবীণ বিচারপতি সমর্থন করেন। একমাত্র বিচারক এইচ আর খান্না স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেন। ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত জনগণের স্বাধীনতা ও জীবনধারণের অধিকার কোনো অবস্থাতেই এবং কোনো আদেশ বলেই লঙ্ঘন করা যাবে না বলে তিনি তীব্রভাবে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু কোনো কাজে এল না। সন্ধ্যে নামার পর ছেলেপুলেরা ঘরে না ফিরলে বাবা-মা দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়তেন। স্বামীরা অফিস থেকে ফিরতে দেরি করলে তাঁদের স্ত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন— এই বুঝি সর্বনাশ হলো। বন্ধু বন্ধুকে অবিশ্বাস করতে শুরু করল, আত্মীয়স্বজনরা পরস্পরের সঙ্গে সংযত হয়ে কথা বলতেন, সরকারি চাকুরেরা সহকর্মীদের সঙ্গে চায়ের আড্ডায় বসা এড়িয়ে চলতেন, কেউ অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতো না। সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতো; এ বুঝি সরকারের চর হয়ে কাজ করছে। তখনকারদিনে কলেজ ইউনির্ভাসিটি

পড়ুয়াদের মধ্যে কফি হাউসের আড্ডা বেশ জনপ্রিয় ছিল। সেখানকার পানীয় বেশ সস্তা ছিল, আর সিগারেট ভাগাভাগি করে টানা যেত। কিন্তু কফি হাউসের কর্মচারীরা টেবিলে জটলা করতে দিতেন না। স্কুলগুলিকেও প্রবন্ধ, বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য আগাম অনুমোদন নিতে হোত। এমনকী এ ধরনের অনেক প্রতিযোগিতা উস্কানিমূলক বলে বাতিল করে দেওয়া হোত এমন নজিরও আছে। বিরোধীনেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের হাত থেকে 'দেশকে বাঁচানো'র অজুহাতে যে অগুনতি পৈশাচিক অপরাধ করেছিল সরকার সেসব বর্ণনা করার জন্য এই উদাহরণগুলি নেহাতই অকিঞ্চিৎকর।

১৯৭১ সালে রায়বেরিলি থেকে লোকসভা আসন জেতার পর, এলাহাবাদ হাইকোর্ট যখন তাঁর নির্বাচন দুর্নীতির দায়ে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিল, তখনই তো ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। তা না করে তিনি সংবিধানের চূড়ান্ত অপব্যবহার করে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে এলাহাবাদ কোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্টে খারিজ করিয়ে, তাঁর সমালোচকদের 'মিসা' আইনে জেলে পুরে, অবৈধভাবে সংসদের মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়ে ভারতীয় সংবিধানের পবিত্রতাকে চূড়ান্তভাবে কলুষিত করলেন। তরুণ যুবকদের সম্বন্ধে কিছু ভীতিজনক গল্প ফেঁদে তাতে রং চড়িয়ে জেলাস্তরের ঈর্ষাকাতর কিছু নেতা যুবকংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হয়ে চাইনিজ কলার দেওয়া সাদা কুর্তা-পাজামা পরে তাদের নেতাদের আগলে রাখতো। ইন্দিরার ছেলে হবার সুবাদে সঞ্জয় গান্ধী ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব হলে। আইন ও বিচারহীন ভারতে সঞ্জয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসী চ্যালা-চামুণ্ডাদের সহায়তায় পুলিশি নির্যাতন বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে গেছিল। প্রখ্যাত লেখক খুশবন্ত সিং তখন 'ইলাস্ট্রেড উইকলি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইন্দিরা ও সঞ্জয়ের এতটাই স্তাবক ছিলেন যে, এই সব অপকর্মের মধ্যে তিনি আপত্তিকর কিছুই দেখতে পাননি। জরুরি অবস্থা জারির সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো। এরপর ভারতের অগ্রণী সম্পাদকরা তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন যে সংবাদপত্র সেন্সর করা হবে। সম্পাদকদের তাঁদের লেখার প্রতিলিপি সেন্সরদের কাছে পাঠাতে হোত। তাঁরা সেগুলি খাটনি করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়তেন। যে অংশ সরকারি নীতির সঙ্গে মিলতো না সেগুলি তাঁরা কেটে দিতেন অথবা যেসব লেখায় সামান্যতম সমালোচনার গন্ধ থাকতো বা যে লেখা তাঁরা 'সহজে' বুঝতে পারতেন না, সেগুলিকে ছাপার অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হোত। পরদিন সকালের কাগজের কপি সেন্সরদের কাছে হাতে-হাতে পৌঁছে দিতে হোত এটা প্রমাণ করতে যে তাঁদের নির্দেশ কোনো ভাবেই অমান্য করা হয়নি। সরকারের কাজের সমালোচনা করার অপরাধে জনসঙ্ঘের মাদারল্যান্ড পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হলো। রাতারাতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় সঞ্জয় গান্ধী অনুগামী কে কে বিড়লাকে বসানো হলো। সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ ও বরুণ সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হলো। ওয়াশিংটন পোস্ট, লন্ডন টাইমস্, লন্ডন ডেইলি টেলিগ্রাফ, নিউজ উইকের সাংবাদিকদের ভারত ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হলো। এরই মধ্যে অনেক সম্পাদক আবার সুযোগ বুঝে ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে গেলেন। সেদিন বেশ কিছু সম্পাদক দল বেঁধে ইন্দিরার বাসভবনে জমায়েত হয়ে রীতিমতো দরখাস্ত করে জানিয়েছিলেন যে, সেন্সরশিপ্ আইনটি যথেষ্ট কড়া নয়, একে আরোও কঠোর করার প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কার্যকর্তাদের জেলে পোরা হলো। স্বয়ংসেবকদের উপর নেমে এল অকথ্য নির্যাতন। পরিস্থিতি এতটাই করুণ হয়েছিলো যে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা গ্রেপ্তার এড়াতে ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, মধু দণ্ডবতের মতো প্রথম সারির বিরোধী নেতাদেরও 'মিসা' আইনে জেলবন্দি করা হয়। সিপিএম জরুরি অবস্থা জারির বিপক্ষে অবস্থান নিলেও, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এর পক্ষ নিয়েছিল। সেকারণে বামপন্থীনেতাদের খুব একটা ভুগতে হয়নি। আমাদের রাজ্যের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ইন্দিরার বিশেষ পরামর্শদাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনিই জরুরি অবস্থার খসড়া তৈরি করেন এবং ইন্দিরার সঙ্গে সেটির সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের কাছে যান। স্বভাবতই তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। একদিকে বাম আর অন্যদিকে অতিবাম তথা নকশাল আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। নকশাল আন্দোলন দমনের নামে পুলিশের নির্মম নির্যাতন প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। এক কথায় একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্রের নমুনা হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার থেকে বড় উদাহরণ আর হতে পারে না। যাই হোক, ভারতীয় জনগণ এর যোগ্য জবাব দিয়েছিল। ১৯৭৭- এর নির্বাচনে ইন্দিরা রায়বেরিলি এবং সঞ্জয় আমেথি থেকে পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস হেরে যায়। তখন ভোটভাগের সমীকরণে বামফ্রন্ট বাংলার ক্ষমতা দখল করে। আজ একথা অনেকেই স্বীকার করেন যে, জরুরি অবস্থা থেকে যদি কেউ সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে তা হলো বামফ্রন্ট, ঠিক যেমনি ভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সবচেয়ে বেশি ফায়দা লুটে ছিল নেহরু-গান্ধী পরিবার। এই পরিবারের সদস্যদের মতোই কংগ্রেসের নেতারা বরাবর বিশ্বাস করে এসেছেন যে, ভারত- শাসনের অধিকার গান্ধী পরিবারের পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার। এমনই মনোভাব থেকে ভারতবর্ষের মতো বিশ্বের মহান গণতন্ত্র বারে বারে এই পরিবারটির হাতে কলঙ্কিত হয়েছে। তাই যখন কংগ্রেসী নেতারা মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান বা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সুর চড়ান তখন অনেকের মতো আমারও মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়— 'কত্তা আস্তে কন, ঘোড়ায় হাসব'।

(তথ্যসূত্র : পাইওনিয়র, বর্তমান পত্রিকা।)

জরুরি অবস্থায় সেই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ

অজিত বিশ্বাস

২৬ জুন ১৯৭৫। ভারতের ইতিহাসের এক কালোদিন। সেদিন হত্যা করা হয়েছিল ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ গণতন্ত্রকে। তার পরিবর্তে দেশে দেখা দিল শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত ডিক্টেটরশিপ। ১৯৭৫ সালের ১২ জুন তারিখে গুজরাটের মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের বলিষ্ঠ রায় জানিয়ে দিলেন। ওই একই দিনে এলাহাবাদের হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে শ্রীমতী গান্ধীর ১৯৭১ সালের নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করা হলো। সারা দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ তাঁর পদত্যাগ দাবি করলেন।

২৪ জুন তারিখে সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার আদেশ দিলেন যে শ্রীমতী গান্ধী লোকসভায় ভোট দিতে পারবেন না এবং সংসদ সদস্য হিসাবে কোনো বেতনও নিতে পারবেন না।

এই রায়ের পর তাঁর পদত্যাগের দাবি আরো জোরালো হয়ে ওঠে। সেই দাবি চূড়ান্ত রূপ পেল নয়াদিল্লীতে ২৫ জুন তারিখে বিশাল বিক্ষোভ সভার মাধ্যমে যখন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ দেশের জনগণের পক্ষ থেকে দুর্নীতি-পরায়ণা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেন। কংগ্রেস দলের এক অংশ থেকেও শ্রীচন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে এই দাবি আরো সোচ্চার হলো।

ওই মিছিলের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সারা দেশে নেমে এল অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত জরুরি অবস্থা। সারা দেশে দেখা দিল মধ্যযুগীয় বর্বর উৎপীড়ন, নির্যাতন আর অত্যাচার। কয়েক দিনের মধ্যেই বন্দী হলো জে. পি. সমেত প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ। চালু হলো প্রেস সেনসরশিপ। সারা দেশে একনায়ক শাসন কাকে বলে খুব কম

জয়প্রকাশ নারায়ণ

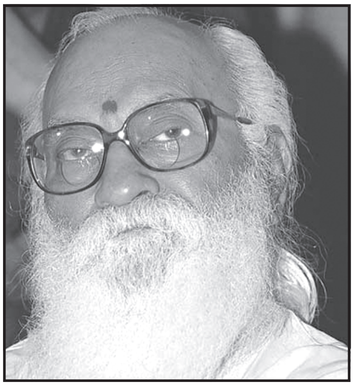

নানাজী দেশমুখ

লোকেরই, এমনকী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদেরও সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। এ সম্পর্কে হিটলারের জার্মানি বা স্ট্যালিনের রাশিয়ার ইতিহাস পড়া জ্ঞানই সম্বল ছিল। জয়প্রকাশের নেতৃত্বে পরিচালিত বিরোধী দলগুলোকে কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হলো। ৪ জুলাই তারিখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করা হলো।

সাধারণ মানুষ তবু আশা করেছিল এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবে বিভিন্ন বিরোধী দল বিশেষ করে বাংলার বামপন্থী দলগুলো। যেসব দল চিরকাল 'সশস্ত্র বিপ্লব' বা 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' কিংবা আরো কতো বিপ্লবের কথা শোনাতো তারা নিশ্চয়ই কোনো বিপ্লবী কার্যক্রম নেবে। 'লাল সেলাম' শুনে শুনে বাংলার মানুষের কান ঝালাপালা হবার যোগাড়, তবু এই বাংলাতে কোনো আন্দোলন তা সশস্ত্র বা নিরস্ত্র কোনোটাই দেখা দিল না। অন্য আর সব বিরোধী দলেরও একই অবস্থা। এইসব বামপন্থী দলের প্রথম সারির নেতাদের কেউই গ্রেপ্তার হননি। এত কিছু দমনপীড়নের মধ্যে গত প্রায় ২ বছর সারা বাংলার কোনো গ্রামেগঞ্জে 'ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' 'লড়াই করে বাঁচতে হবে' আর 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেবার মতো একটি মার্কসবাদী বা বাম-কণ্ঠও শুনতে পাওয়া যায়নি।

সারা ভারতের চিত্রও একই। কোনো রাজনৈতিক দলই জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে কিছু করতে পারেনি। জয়প্রকাশের সভাপতিত্বে গড়ে উঠেছিল জনসংঘর্ষ সমিতি। সম্পাদক ছিলেন নানাজী দেশমুখ। জরুরি অবস্থা ঘোষিত হবার পরে জুলাই এবং আগস্ট মাসে সারা ভারতের কিছু স্থানে ছোট ছোট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা খুব সহজেই শেষ হয়ে গেল। সারা দেশের যখন এই অবস্থা তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এগিয়ে এল। জরুরি অবস্থায় সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করার পরে এক মাসের

দিল্লীর জনসভায় ভাষণরত জয়প্রকাশ নারায়ণ।

মধ্যে কেবল সঙ্ঘেরই ৪৫ হাজার স্বয়ংসেবক গ্রেপ্তার হন। এই প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে এবং আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন গড়ে তুলতে সঙ্ঘের দু' মাস সময় লেগেছে। তারপর সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জনসংঘর্ষ সমিতিকে শক্তিশালী করে আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঠিক করলেন। জনসংঘর্ষ সমিতির সাধারণ সম্পাদক নানাজী দেশমুখ ৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ধরা পড়েন। তারপর সম্পাদক নিযুক্ত হন শ্রীরবীন্দ্র ভর্মা (বর্তমান শ্রমমন্ত্রী)। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সহ-সরকার্যবাহ শ্রীমোরপন্থ পিংলে আন্দোলন শুরু করার জন্য সারা দেশে পরিভ্রমণ করেন। শ্রীভর্মা তখন মুসলমানের ছদ্মনাম নিয়ে ভ্রমণ করতেন। কলকাতায় যখন এলেন তখন স্বয়ংসেবকদের বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হলো। শ্রীপিংলেও সেই সময় কলকাতায় এলেন। মিলিতভাবে নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে বোঝালেন। শ্রীভর্মা স্বাভাবিক কারণেই আন্দোলনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন শ্রীপিংলের ওপর। তাঁর কথা অনুসারেই সমস্ত পরিকল্পনা ও ভ্রমণসূচি স্থির হলো। লোক-সংঘর্ষ সমিতি গণ-সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সময় ঠিক হলো ১৯৭৫ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত।

জনসংঘর্ষ সমিতির প্রায় সব নেতাই তখন

প্রফুল্ল চন্দ্র সেন

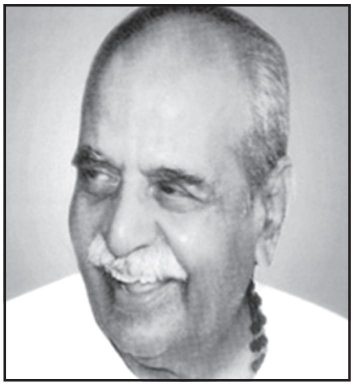

মোহপন্ত পিংলে

জেলে। বাইরে ছিলেন কেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনিই পশ্চিমবাংলা কমিটির সভাপতি ছিলেন। এখানকার নেতৃবৃন্দ প্রথমে আন্দোলন চালাতে রাজি হলেন না। কারণ সারা দেশের ভীত সন্ত্রস্ত পরিবেশের ফলে কেউই অহিংস সত্যাগ্রহে রাজি হবেন না। সঙ্ঘের কয়েকজন দেখা করেন প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবাংলার কার্যবাহ শ্রীঅমল কুমার বসু, শ্রীকেশব দীক্ষিত ও শ্রীবংশীলাল সোনী প্রমুখ দেখা করেন এবং আন্দোলন করার কথা ঠিক করেন। সমিতির নেতারা প্রথমে বিশ্বাস করলেন না যে সঙ্ঘের কেবল কলকাতায় সত্যাগ্রহ করার জন্য ২০০ জন নাম লিখিয়েছেন।

সারা দেশে কেবল সঙ্ঘের ১ লক্ষ স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহের জন্য নাম লিখিয়েছেন এই কথা প্রথমে অনেক বাঘা বাঘা নেতাই বিশ্বাস করেননি। সঙ্ঘ এই বিরাট জনশক্তিকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এই পরিবেশে নামাতে পারে কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি প্রথমে। সারা পৃথিবীর আন্দোলনের ইতিহাসে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কেবল একটি দাবি নিয়ে ২ মাসের মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষের গ্রেপ্তার হওয়া আর কখনও হয়নি। ভারতেও ইতিপূর্বে দুটি আন্দোলনে দেখা গেছে বৃহৎ সংখ্যা। ১৯৪২ সালের 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন এবং ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অহিংস সত্যাগ্রহ। তাতে সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫ হাজার এবং ৫০ হাজার। এবারের এই আন্দোলন সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কাগজে সেন্সরশিপ না থাকলে এবং এই ভয় ও সন্ত্রাসের রাজত্ব না হলে এই সংখ্যা হয়ত ১০ গুণ বৃদ্ধি পেত।

সারা ভারতে ১৪ নভেম্বর থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। মাত্র ৫ দিনে সারা দেশে ১১ হাজার ব্যক্তি সত্যাগ্রহ করেছে।

এই সময় যে সংবাদ বুলেটিন বের হত তার সাত নম্বর বুলেটিন 'সংগ্রাম'-এর খবর ছিল— ''জন-সংঘর্ষ সমিতির ডাকে গত ১৪ নভেম্বর থেকে সারা ভারতে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। ইতিমধ্যে ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তি অহিংস সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছেন। আমাদের লক্ষ্য শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের অবসান করে গণতান্ত্রিক শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ১৪ নভেম্বর সত্যাগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

দিল্লী : দিল্লী মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রীঈশ্বরদাস মহাজনের নেতৃত্বে শতাধিক সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন। সহস্রব্যক্তি এঁদের অভিনন্দন জানান।

বিহার : ১৪২টি স্থানে ব্যাপক সত্যাগ্রহ হয়েছে।

মহারাষ্ট্র : নাগপুরে সত্যাগ্রহী দলে মহিলাই ছিলেন ৪৫ জন। থানে শহরে ৩৫ জন কারাবরণ করেন। বোম্বাইর ৬ স্থানে সত্যাগ্রহ হয়। স্থানীয় গুজরাট দৈনিক এই ঐতিহাসিক খবর প্রকাশ করায় সরকার ওই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে। এই সম্পর্কে এখন বোম্বাই হাইকোর্টে শুনানি চলছে। কর্ণাটক প্রদেশে ৯০০ সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন।

লক্ষ্ণৌ : উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামপ্রকাশ এক বিরাট সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব দেন। মির্জাপুরে তিন শতের বেশি ব্যক্তি ওই দিন কারাবরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ : এখানে কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি পথসভায়

অমল কুমার বসু

বংশীলাল সোনী

জরুরি অবস্থার নিন্দা করে ভাষণ দেন। পুলিশ জন-সংঘর্ষ সমিতির নেতা শ্রীঅশোক মুখার্জী-সহ আরও দুজনকে এই পথসভা করার 'দায়ে' গ্রেপ্তার করে, যদিও তাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরা জামিনে মুক্ত আছেন। ওই দিন আলিপুরে কোর্টের সামনে পথসভা করে ২৪ পরগনার ৯ জন সত্যাগ্রহী কারবরণ করেন। আরো কিছু খবর ছিল। সত্যাগ্রহের রূপরেখা বিভিন্ন রকমের ছিল। দিল্লীতে ২৮ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত কমনওয়েলথ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সম্মেলন ছিল। এই প্রতিনিধিরা এর পরে সারা ভারতে ভ্রমণ করেন। প্রতিনিধি দলের সম্মানে আগ্রায় একটি বড় হোটেলে ভারত সরকার একটা সভার আয়োজন করেন। সমস্ত প্রতিনিধি টেবিলে বসেই হাতে হাতে পেলেন লোক-সংঘর্ষ সমিতির প্রচার পত্র সম্বলিত মোটা প্যাকেট। সবাই সেই প্যাকেট তাড়াতাড়ি পকেটস্থ করেন।

তামিলনাড়ুতে ১৪ নভেম্বর ১৪টি জেলাতেই সত্যাগ্রহ হয়। দেড়শো জন ছিলেন। রাজস্থানে ১৪ নভেম্বর রাজ্যের ৬০টি স্থানে সত্যাগ্রহ করে ৫১৫ জন কারাবরণ করেন। কেরলে ১৪ নভেম্বর ২৫টি স্থানে ২৮০ জন কারাবরণ করেন। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার চালায়। বুলেটিন 'সংগ্রাম'-এর ৮ নম্বরে খবর ছিল কলকাতার সত্যাগ্রহ সম্পর্কে। ২৫ নভেম্বর ঠিক ৪টের সময় চোরঙ্গীর মোড়ে ১০ জন জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে এগিয়ে যান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ সবাইকে ধরে নেয়। ঠিক এক ঘণ্টা পরে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে ১১ জন সত্যাগ্রহী ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড এবং কয়েকশত লিফলেট বিতরণ করেন। অফিস ছুটির সময়। সবাই অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ কি হলো। কাদের এই কণ্ঠস্বর! সাধারণ মানুষ সেদিন লিফলেট নিতেও ভয় পাচ্ছিল। হায় বিপ্লবী বাংলা! দিল্লীতে ১৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার জন্মদিন ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা চালু হতেই স্লোগান আরম্ভ হলো— 'একনায়কতন্ত্র সমাপ্ত কর, গণতন্ত্র চালু কর'। কয়েকজন সত্যাগ্রহী ইস্তাহার দিতে গিয়েও ধরা পড়েন।

সারাদেশে প্রতিটি জেলায় সত্যাগ্রহ চলেছে। কেবল কর্ণাটক প্রদেশেই বুলেটিন—১৬তে 'সংগ্রাম' খবর দিয়েছে— 'জরুরি অবস্থার ছত্রচ্ছায়ায় সারা ভারতে স্বৈরতন্ত্রের যে লীলা ইন্দিরা সরকার চালিয়েছে— তার প্রতিবাদে গত ১৪ নভেম্বর থেকে অহিংস সত্যাগ্রহ করে যাঁরা বীরের মতো কারাবরণ করলেন সেই প্রতিবাদীদের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরমুহূর্ত থেকে সারা ভারতে প্রায় ৫০ হাজার লোককে বন্দী করা হয়েছিল। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধীর জেলে এক লক্ষ ৭৫ হাজার দেশপ্রেমিক বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বন্দী আছেন। এরই নাম গণতন্ত্র!"

একই বুলেটিনে আরো খবর রয়েছে, "দক্ষিণ ভারতের কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও কর্ণাটকের সংবাদ জানা গেছে যে, এই কয়টি রাজ্যেই ২৫ হাজারেরও বেশি সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেছেন। সত্যাগ্রহীদের ভেতর অধ্যাপক, উকিল, ছাত্র, কৃষক, মজদুর, বনবাসী ইত্যাদি সর্বস্তরের লোক রয়েছেন।"

মহারাষ্ট্র প্রদেশে ১ হাজার মহিলা, ৩ হাজার অধ্যাপক ও শিক্ষক, ৬ হাজার কৃষক ও অন্য জীবিকাধারী কারাবরণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ১৬৩৩ জন। কর্ণাটকে বন্দী ১১ হাজার সত্যাগ্রহীর ভেতরে ৩ হাজার ২৪৩ জন কৃষক, ছাত্র ২ হাজার ৯০৯ জন, শ্রমিক আছেন ৮২৭ জন। বাকি অন্য জীবিকাধারী। সত্যাগ্রহীরা ৩ হাজারেরও বেশি গ্রামে গিয়ে ইস্তাহার বিলি করেছেন।

সারা ভারতের এই সব বন্দীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। বাকিরা হলেন সংগঠন কংগ্রেস, বি এল ডি এবং সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য। এই সত্যাগ্রহ ছাড়া আকালীরা জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকে সত্যাগ্রহ করেছেন নির্বাচন ঘোষণার দিন পর্যন্ত। এই সত্যাগ্রহীদের মোট সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার, কেবল পাঞ্জাবেই এই আন্দোলন চলেছে। কেরল প্রদেশে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ৪ হাজার ছিল। এই বিরাট আন্দোলন সারা ভারতের ৩৬৬টি জেলার ভেতর ৩০২টি-তে চলেছে। ভারতের ইতিহাসে কোনো আন্দোলনই এত বিস্তৃত রূপ পায়নি। বামপন্থীরা এই প্রদেশে জরুরি অবস্থার আগে ২৫ বছর ধরে অনেক কৃষক-মজুরকে পুলিশের লাঠি ও গুলির মুখে এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই ২ বছর ধরে অনেক ক্যাডারওয়ালা বামপন্থী দল চুপসে রইল। এমনকী অন্য দলের লোকেরাও অনেক পিছিয়ে ছিল। জনসংঘর্ষ সমিতির অনেক সদস্য জেল থেকে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। বাহিরের নেতারাও ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যেও খুব কম নেতা সত্যাগ্রহী হয়েছেন। সৌখিন রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র আন্দোলনের মধ্যে আরো বেশি প্রকট হয়ে পড়েছে।

ঠিক এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে কেবল দেশের স্বার্থের কথা ভেবে এগিয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন। শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি এই ধরনের সত্যাগ্রহ পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি। ভারতেও হয়নি। এত বিরাট ও ব্যাপক সত্যাগ্রহ আর কেউ ভাবতেও পারেনি।

(স্বস্তিকা, ২৭. ০৬. ১৯৭৭)

চিঠিপত্র

‘যত মত তত পথ’

গত ৮ জুন ২০১৫ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রভাত কুমার মণ্ডলের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ‘তব কথামৃতম্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের আলোচনা’ গ্রন্থের প্রথম অখণ্ড সংস্করণের ৩২৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত কথা ‘যত মত তত পথ।’ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ লিখেছেন ‘বাস্তবিক এমন কথা বলবার অধিকারী শুধু তিনিই ছিলেন। অন্যেরা যখন বলেন, সে শুধু কথার কথা। কিন্তু ঠাকুর বলছেন নিজে উপলব্ধি করবার পরে। কোনোরকম সাধনা তো তিনি বাদ দেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, কতরকম মত ও পথ দিয়ে তিনি গেছেন।’ আশা করি, লোকেশ্বরানন্দের বৈদগ্ধ্য নিয়ে মণ্ডল মহাশয়ের কোনো সংশয় নেই।

মণ্ডল মহাশয় বলেছেন যে, সারদাদেবীর বক্তব্যেও এর কোনো উল্লেখ নেই। সবিনয়ে জানাই, শ্রীশ্রীমা কোনোও জনসভায় বা ধর্ম সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন এমন তথ্য তাঁর কোনো প্রামান্য জীবনীগ্রন্থে নেই। তিনি অধিকাংশ সময়ে ভক্তদের সাথে আলাপ-চারিতায় কিছু সদুপদেশ দিয়েছেন। তাঁর জীবনই তাঁর সবচেয়ে বড় বক্তব্য।

মণ্ডল মহাশয়ের জ্ঞাতার্থে আরো জানাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে ‘বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ’ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ওই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ২২৩, ২৭৫, ৪০৮, ৫৪০, ৬২৮, ৭০৯, ৭৩৫ ও ৭৬০ পৃষ্ঠায় ‘যত মত তত পথ’-এর উল্লেখ আছে।

মণ্ডল মহাশয় আরো লিখেছেন যে, ‘যারা পরমত ও পরধর্ম বিনাশকারী তারাও যেমন সত্য, তেমনি তারাও সমানভাবে সত্য যারা পরমতসহিষ্ণু। বিষয়টা স্ববিরোধী এবং গোলমেলে। স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে, এর মধ্যে তো স্ববিরোধিতা ও গোলমালের কোনো প্রশ্ন নেই। কোনো কোনো মানুষ আছেন যাঁরা অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি বা তাঁদের ধর্মীয় আচরণের প্রতি কোনো সম্মান বা সহিষ্ণুতা দেখান না। আবার, এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সব ধর্মের মানুষের প্রতি সম্মান ও ঔদার্য দেখান। মণ্ডল মহাশয় লিখেছেন, তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে অনুরোধ করি, ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনার উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অন্য যে ব্যাপক গ্রন্থসম্ভার রয়েছে সেগুলো একটু পরে দেখবেন। কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত না হয়ে এবং বিষয়টি পুরোপুরি আত্তীকরণ না করে বোধহয় মতামত জাহির করার চেষ্টা না করাই ভালো।

—শবরী ঘোষ,
কলকাতা-১৫৩।

জরুরি অবস্থা ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

জরুরি অবস্থা জারির প্রায় ছয় মাস আগেই পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পরিচালনায় তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সভাপতি (সর্বভারতীয়) দেবকান্ত বড়ুয়া, মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সভাপতি রজনী প্যাটেল ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই খসড়া সিদ্ধান্ত বা অর্ডিন্যান্সটি তৈরি করেন।

সর্বভারতীয় সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এইচ. আর গোখলের নেতৃত্বে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁর কলকাতা বাসভবনে ১৯৭৫ সালের ৭ জানুয়ারি রাত দশটা নাগাদ এই অর্ডিন্যান্সটির তৈরি করেন। পরদিন সকাল অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি ইন্দিরা গান্ধীকে টেলেক্স-এর মাধ্যমে এই বার্তাটি পাঠান। সেই বার্তা বা চিঠিটি এই রকম ছিল, তার কিছু অংশ তুলে ধরলাম—

“প্রিয় ইন্দিরা,

দেবকান্ত বড়ুয়ার সঙ্গে আমাদের আলোচনা এই মাত্র শেষ হয়েছে। আমি তোমাকে অতি দ্রুত জানতে চাইছিলাম কিন্তু তুমি নৈশ ভোজে ব্যস্ত ছিলে। এখন অবধি কোনো নামের তালিকা বা কিছুই হয়নি। গোখলে ও বড়ুয়ার সহযোগিতায় আজ রাতের মধ্যে এই খসড়া তৈরি করা হয়েছে। আমরা অর্ডিন্যান্সের প্রধান দিকগুলি ঠিক করেছি। তুমি ব্রহ্মানন্দকে (ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) এই কাজটি যতশীঘ্র সম্ভব শেষ করতে বলো। কংগ্রেসের সব মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো উচিত যাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও আনন্দমার্গ প্রধানদের তালিকা তৈরি করতে। এই অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে আর কিছু জানানো প্রয়োজন নেই, কিন্তু তালিকাটি দ্রুত তৈরি করতে হবে। এই অর্ডিন্যান্স জারি হলেই দ্রুত কাজে লাগাতে হবে। যত শীঘ্রই সম্ভব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকতে হবে।

সিদ্ধার্থ”

এই চিঠিতে বামপন্থীদের পক্ষে বন্ধুত্বমূলক আচরণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এর ছয় মাস পরে ১৯৭৬-এর ২৬ জুন মধ্যরাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আহমেদ এই অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থায় সই করেছিলেন। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর গরিবি হাটাও-এর ডাক দিয়েছিলেন। এই গরিবি হাটাও-এর প্রেক্ষাপট ছিল অবিভক্ত রাশিয়ার সহযোগিতায় কৃষিবিপ্লব অর্থাৎ ‘সবুজ বিপ্লব’। এই সবুজ বিপ্লবের ফলে ১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতবর্ষে প্রায় ৭০-৭২ শতাংশ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে নেমে আসে। ১৯৭৩-৭৪ সালে দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি পায় প্রায় ২৫ শতাংশ। এর ফলে দেশে প্রায় কৃষক-সহ ১০ হাজারের উপর জনসাধারণ আত্মহত্যা করে। জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ১৩ দিন আগে ইন্দিরা গান্ধীর রায়বেরিলির নির্বাচনের জয় বাতিল করে দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫-এর ২৩ জুন সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে।

—পুলক ঘোষ চৌধুরী,
বারাসাত-১২৬।

ধর্ম ও বিজ্ঞান : মেল বন্ধনের ভাবনা

বিরাজ নারায়ণ রায়

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। একদিন কথায় কথায় উঠে এলো ধর্ম ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গ। একটি পত্রিকায় একজন লেখক ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিবাদ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এই নিয়েই আমাদের আলোচনার সূত্রপাত। আমি বললাম, ধর্ম ও বিজ্ঞানের রসায়নটা ঠিক কী? এদের কী কোনোদিনই মিল হবে না, নাকি এরকমই চলবে?

প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক বললেন— আমরা জীবনে যা কিছু করছি, আমাদের চারিদিকে যা কিছু ঘটেছে তার সবকিছুর পিছনেই বিজ্ঞান আছে। কিন্তু কোনো কোনো সময় এমন অনেক কিছু ঘটে আমরা যার কারণ খুঁজে পাই না, বিজ্ঞানও তার যুক্তি দিতে পারে না। আমাদের বিজ্ঞান হয়তো এখনও সেই পর্যায়ে উঠতে পারেনি। তাই বলে কি সেই সব ঘটনার কোনো সদুত্তর নেই।

বিজ্ঞান যখন উত্তর দিতে পারে না তখন মানুষ দর্শনের আশ্রয় নেয়। দর্শন তার সমাধানের পথ বলে দেয়। ধরা যাক দর্শনের যুক্তি মানুষের জিজ্ঞাসু মনকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। মানুষ কি তখন হতাশায় নিজেকে গুটিয়ে নেবে? না, সেটাও হয় না। বিজ্ঞান, দর্শন তারপর মানুষের শেষ হলো আশ্রয় ধর্ম। এখানেই মানুষ তার সন্তুষ্টিকে খুঁজে পায়। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমীকরণটি এরকমই। পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পর সহযোগী। এটাই আদর্শ সমীকরণ।

ভদ্রলোকের কথাগুলি শুনে ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে আমার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ধরা দিল। সারাধণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন অনেক বিজ্ঞানীও আছেন যারা দেবদেবী বা ধর্মে বিশ্বাস রাখেন। ইসরো-র চেয়ারম্যান কে রাধাকৃষ্ণন, তিনিও মঙ্গলযান মহাকাশে পাঠাবার আগে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছিলেন। যাঁরা ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখেন তাঁরা তো ধর্মের মধ্যে জীবনে চলার পথে আলো দেখতে পান। তাতে ক্ষতি কি? এতে তো বিজ্ঞান চেতনায় তো কোনো আঘাত পড়ছে না।

আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরে এমন অনেক মহাপুরুষ, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ছিলেন যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্ম পালন করছেন। বিজ্ঞানের পুরোধা আইনস্টাইন তো নিজেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ছিলেন। নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাই বলে তাঁর বিজ্ঞান চেতনার কোনো অভাব ছিল না। 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ'— রবীন্দ্রনাথের এই গানে গভীর বিজ্ঞান চেতনার এক প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। বিবেকানন্দও জীবন গঠনের জন্য ধর্মকেই অবলম্বন করতে বলেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রাখেননি, রাখতে বলেনওনি। বরং ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহাবস্থান এঁদের জীবনকে আরোও সমৃদ্ধ করেছে। চরিত্র ও চেতনা দুই-ই এনে দিয়েছে।

ধর্মাচরণের কারণে মানুষ সৎ, পরিশ্রমী ও চরিত্রবান হয়। রত্নাকর যেমন দস্যু থেকে ঋষি হয়েছিলেন, তেমনি প্রত্যেক মানুষের আত্মিক পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ এক কথায় মানব কল্যাণ। বিজ্ঞানও তাই চায়। মানুষের হাতে আরো নতুন নতুন প্রযুক্তি, নতুন নতুন ওষুধ আসুক যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে। নেপালের ভূমিকম্পে কত মানুষের মৃত্যু হলো। আজ যদি ঝড়ের মতো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার যন্ত্র থাকত তাহলে এতো মানুষকে মারা পড়তে হোত না। ভূমিকম্পের আগেই যাতে পূর্বাভাস দেওয়া যায় বিজ্ঞান সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ধর্ম ও বিজ্ঞান দুই-ই নিজের জায়গা থেকে মানব কল্যাণের কথা ভাবছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মানুষ যদি নিজের কায়েমি স্বার্থে ব্যবহার করে তাহলে ধর্ম বা বিজ্ঞান দায়ী নয়। দায়ী মানুষের অসৎ চিন্তা ভাবনা।

ভদ্রলোককে আমি আর একটা প্রশ্ন করলাম।

এভাবে চলতে থাকলে তো মানব সভ্যতা খুব শীঘ্রই সঙ্কটের মুখোমুখি হবে। তাহলে মানুষের ভেতর থেকে এই অসৎ ভাবনা দূর করার দায়িত্বটা কার?

ভদ্রালোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন— বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে, কিন্তু মানুষের মনে সৎ চিন্তা তৈরি করার মতো যন্ত্র এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। বিজ্ঞান মানুষের শরীরকে কব্জা করতে পারে কিন্তু মনকে নয়। এই কাজটা একমাত্র ধর্মই করতে পারে। ধর্মচর্চা একধরনের মনের কাউন্সিলিং। এখন অবশ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মনের নানা কাউন্সিলিং করা হয়। সেদিক থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো ধর্মকেও এক প্রকার বিজ্ঞান বলতে পার। যেহেতু মানুষের মনে সৎ চিন্তা বপনের ব্যবস্থা কেবলমাত্র ধর্মেই আছে। তাই এই দায়িত্বটা ধর্মেরই বেশি।

একমনে আমি ভদ্রলোকের কথাগুলি শুনছিলাম। এখানে যেটা আলোচ্য সেটা হলো, ধর্ম ও বিজ্ঞান দুইয়ের লক্ষ্যই এক— মানব কল্যাণ। দুটোই জ্ঞানের ভিন্ন শাখা। মানুষের দুষ্টবুদ্ধি কখনো কখনো এদেরকে পথভ্রষ্ট করে। কিন্তু ধর্ম ও বিজ্ঞান দুইই যদি নিজের নিজের পথে সঠিকভাবে চলে তাহলে কোনো বিবাদ নয়, পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হয়ে উঠতে পারে। আর মানুষের মধ্যে শুভ বুদ্ধির প্রসারে ধর্ম যদি একটু বেশি দায়িত্ব নেয় তাহলে মানব সভ্যতা হয়তো খুব অল্প সময়েই তার বিকাশের সর্বোচ্চ শিখর দর্শন করবে। ■

প্রভু জগন্নাথের নবকলেবর

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল

প্রভু জগন্নাথ কলেবর ত্যাগ করবেন। নতুন কলেবর গ্রহণ করবেন। ভৌম-বৈকুণ্ঠ শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর এ এক চমৎকার লীলা। তাঁকে নিয়ে যত উৎসব-অনুষ্ঠান তার মধ্যে এই অনুষ্ঠান আড়ম্বর, উদ্দীপনায় 'লোক- সংঘট্টে' সর্বোত্তম। কারণ, এ লীলা প্রতিবছর হয় না।

শাস্ত্র মতে, বারো বছর অন্তর দারু-কলেবর ত্যাগ করার কথা। কিন্তু এখানে তা হয় না। কখনও বারো, কখনও উনিশ, কখনও তার চেয়ে বেশি বা কম। রেকর্ড জানাচ্ছে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে নবকলেবর হয়েছিল। তারপর ১৮০৯, ১৮২৮, ১৮৫৫, ১৮৭৪, ১৮৯৩-এ সম্পন্ন হয়। বিংশ শতাব্দে ১৯৩১, ১৯৫৩, ১৯৬৯, ১৯৭৭, ১৯৯৬ সালে নবকলেবর অনুষ্ঠান হয়েছে। একবিংশ শতাব্দে এবার ২০১৫ সালে প্রভুর আরেকবার নবকলেবর হতে চলেছে। দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট সময় বলে কিছু নেই। যে বছর চন্দ্রমাস গণনা অনুসারে দুটি আষাঢ় মাস হয়, সেই বছরই নবকলেবর হয়। সে বছর জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর 'অনবসর' ১৫ দিনের পরিবর্তে ৪৫ দিন হয়। বর্তমান বছরে ২৩ মে নবকলেবরের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, যা সম্পূর্ণ হবে প্রায় দু'মাস পর ১৮ জুলাই রথযাত্রায়।

নীলাদ্রি মহোদয়ের নির্দেশ মতে, এরকম আষাঢ় পড়লে যাকে পুরুষোত্তম মাস বা মলমাসও বলে, সে বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের শুভদিনে পুরীর রাজার আদেশে বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসু বংশের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ দারুব্রহ্মের দারু সন্ধানে বের হবেন। শ্রীভগবানের নীলমাধব অবতারের সময় শবর বিশ্বাবসু প্রভুর সেবা করেছিলেন। তাঁর বংশধরগণ দারুব্রহ্ম অবতারে শূদ্র সেবক হিসাবে অংশ নেন। এঁরা দয়িতা নামেও পরিচিত। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা আর এই নবকলেবরে এঁদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর বিদ্যাপতি ছিলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ-পুরোহিত। তিনি রাজ-আজ্ঞায় অনেক দেশ ঘুরে শবর রাজ্যে গিয়ে শবর কন্যা ললিতার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে অনেক কৌশলে নীলমাধব দর্শন করেন এবং দারুব্রহ্ম অবতার শ্রীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বংশধরগণ ব্রাহ্মণ পাণ্ডা বা পূজারি রূপে প্রভুর সেবা করছেন।

এই দুই প্রতিষ্ঠাতা সেবকের বংশধরগণের সঙ্গী হন কোনো রাজপ্রতিনিধি; বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ, দক্ষ সূত্রধরগণ। দারুর সন্ধানে দলটি প্রথমে যান শ্রীক্ষেত্র থেকে ৪০ কিলোমিটার পূর্বে কাকটপুরে, দেবী মঙ্গলার কাছে। দেবী আসলে মহামায়া, তাঁর কাছে দয়িতাপতিগণ প্রাচী নদীর তীরে এক সময় দেবীর মন্দির ছিল, বন্যার ফলে এখন মন্দির কিছু দূরে সরিয়ে আনা হয়েছে। এখানে দেবীর যথাবিধি পূজার্চনার পর সেবকগণ 'নৃসিংহ' মন্ত্র জপ করে স্বপ্নাদেশের প্রত্যাশায় হত্যে দেন, দেবীর কৃপা ভিক্ষা করেন। তারপর দেবীর কৃপায় বৃক্ষের সন্ধান মিললে দলটি চারটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করেন। বৃক্ষের কাছে গিয়ে দারুর লক্ষণ বিচার করেন। শাস্ত্রানুসারে, শ্রীজগন্নাথদেবের দারু কৃষ্ণবর্ণের, শ্রীবলভদ্রের শ্বেত বর্ণের এবং সুভদ্রার দারু হবে লাল বর্ণের। তাছাড়া, বৃক্ষসমূহে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন থাকার কথা। বৃক্ষ স্বাদ তিক্ত হবে না, অল্প মধুর হবে। বৃক্ষের গোড়ায় বা কাছে থাকবে উইঢিবি, সেখানে থাকবে বিষধর সাপ। বৃক্ষগুলি দেখতে হবে সুন্দর, শোভাময় আর তিনটি পাহাড়, তিনটি নদী বা তিনটি পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হবে।

বৃক্ষ পাবার পর শ্রীজগন্নাথদেবের 'আভামালা' বৃক্ষের গায়ে পরানো হবে। তিনদিন ধরে যজ্ঞ হবে। একে 'বনযজ্ঞ' বলে। যজ্ঞের হোমানলে নৃসিংহদেবের

উদ্দেশে ঘি অর্পণ করা হবে।

বর্তমান বছরে নবকলেবরের জন্য শ্রীজগন্নাথের বৃক্ষ পাওয়া গেছে ভুবনেশ্বর থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে ঘারিপেড়িয়া গ্রামে। জগৎসিংপুর জেলায় অবস্থিত এই গ্রাম। এই জেলারই আরও দুটি গ্রাম কনকপুর ও আভাঙ্গায় মিলেছে যথাক্রমে শ্রীবলভদ্র ও সুভদ্রা এবং সুদর্শনের বৃক্ষ।

যাগযজ্ঞের পর বৈদিক স্তোত্র, প্রভুর প্রিয় ভজনকীর্তনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাপতি বৃক্ষে স্বর্ণ কুঠারে আঘাত করেন, বিশ্বাবসু রুপার কুঠারে আঘাত করেন এবং শেষে বিশ্বকর্মা রূপী সূত্রধরগণ লোহার কুঠারে আঘাত করে বৃক্ষ ছেদন করেন।

ভূপতিত বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পত্রসকল গভীর গর্তের মধ্যে পুঁতে ফেলা হয়। এরপর বৃক্ষকে নবনির্মিত গো-চালিত শকটে তুলে নতুন বস্ত্রে, পুষ্পে, মাল্যে সুসজ্জিত করে যাত্রা শুরু হয় মন্দিরের অভিমুখে। দারুবৃক্ষগুলি তিন স্থান থেকে আনার সময় পরম আনন্দে ভক্তগণ ভজন কীর্তন গাইতে থাকেন। প্রভুর নামে দেবীর নামেও 'জয়ধ্বনি' ওঠে। শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্য বাজে। যে সমস্ত গ্রাম বা শহরের মধ্য দিয়ে দারুবাহী গাড়িগুলি আসে সেইসব গ্রাম বা শহরের ভক্তিপূর্ণ নরনারী পুষ্পে মাল্যে, প্রজ্বলিত প্রদীপে, ধূপধুনোয় দারুগুলিকে বরণ করেন, নৈবেদ্য দেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন, দু'বাহু তুলে নাচেন, আনন্দে মাতোয়ারা হন। এ এক অপূর্ব আনন্দময় পবিত্র দৃশ্য। এই দারুযাত্রার যাঁরা সাক্ষী হন, ধন্য হন তাঁরা। তিনটি গাড়ি-ই সমবেত হয় আঠারো নালায়। প্রথামতো মহারাজ গজপতি এগিয়ে যান, বিবিধ উপচারে স্বাগত জানান।

সেখান থেকে দারুগুলি কোইলি বৈকুণ্ঠের দারুমণ্ডপে স্থাপন করা হয়। স্নানযাত্রার দিন দারুগুলির মহাস্নান হয়, শুরু হয় মহাযজ্ঞ। একশত আটজন ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের প্রারম্ভে বিশ্বকর্মা রূপী প্রধান সূত্রধর শিল্পীকে শ্রীজগন্নাথের অঙ্গবস্ত্র' অর্থাৎ পরিধেয় বসন দান করে নবকলেবরের কার্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ বলে চারজন বিশ্বকর্মারূপী সূত্রধর দারুমণ্ডপে মূর্তি নির্মাণে হাত লাগান। এখানে পতি-মহাপাত্র ও বিশ্বকর্মাগণ ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার থাকে না, বিশেষ নজরদারিতে বিগ্রহ নির্মাণ চলে।

শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও সুভদ্রাদেবীর বিগ্রহ চার ভাগে ভাগ করা হয়। —শ্রীমুখ, হিয়া,পরিধাপানা ও শ্রীচরণ। বক্ষপঞ্জরের স্থানে থাকে একটি ছোট গর্ত, এখানেই ব্রহ্ম স্থাপন করা হয়। ত্রয়োদশীতে মূর্তি নির্মাণ সম্পন্ন হয়। যজ্ঞেরও হয় পূর্ণাহুতি। অতঃপর সন্ত, মহান্ত, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, মঠাধীশ, ছতিশা নিয়োগ সেবায়েত ও আচার্যগণ শ্রীমূর্তির সংস্কার ও ন্যাস করতে শ্রীমণ্ডলে উপস্থিত হন। আচার্য রাজগুরুগণ কুশাগ্রে স্পর্শ করে বিগ্রহ-চতুষ্টয়কে সংস্কার করেন। চতুর্দশী তিথিতে হোম ও আহুতির পর পর বিগ্রহকে মন্দিরের ভিতরে আনা হয়, অমাবস্যার রাতে পুরাতন বিগ্রহের মুখোমুখি হন নববিগ্রহ, এই রাতে ব্রহ্ম পরিবর্তন হয়।

এই অমাবস্যার রাতের ঠিক মধ্যখানে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ দয়িতাপতি পট্টবস্ত্রে নিজের চোখ ঢেকে প্রভুর পুরাতন কলেবর থেকে ব্রহ্মকে নতুন কলেবরের মধ্যে স্থাপিত করেন। শ্রীক্ষেত্রের অন্যতম পাণ্ডা শ্রীবিশ্বনাথ পাণ্ডা জানান— 'এই কাজ অত্যন্ত রহস্যময় এবং অত্যন্ত গোপনে সম্পন্ন হয়।' চারমূর্তির ব্রহ্ম সংস্থাপনে মোট চারজন দয়িতাপতি নিযুক্ত হন। এই সময় জনগণ নানা দৈবদুর্বিপাকের চিন্তায় আশঙ্কিত থাকেন। পুরী শহরে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কোথাও কোনো আলো জ্বলে না।

ব্রহ্ম নবকলেবরে স্থানান্তরের পর শ্রীবিগ্রহদের যোড়শোপচারে পূজা করা হয়। নববিগ্রহ রত্নবেদিতে আসীন হন। আর পুরাতন বিগ্রহগুলি শকটে করে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে কোইলি বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পূর্বে করা হয়েছে ন' হাত গভীর ও ছ' হাত ব্যাসার্ধের গর্ত। সেই গর্তে রেশমের শয্যায় তুলোর বালিশে সুদর্শনসহ তিন বিগ্রহকে সমাহিত করা হয়। লোকাচার মেনে দয়িতাপতিগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন, কৃষ্ণচতুর্দশী থেকে ১০ দিন অশৌচ পালন করেন, হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন, একাদশদিনে মুক্তিমণ্ডপে বসে তেল মেখে মার্কণ্ডেয় সরোবরে ক্ষৌরকর্ম ও স্নান করেন; তারপর মন্দিরের সিংহদ্বারের সিঁড়িতে পা তুলে মহারাজের দেওয়া নতুন বস্ত্র পরে মন্দিরে আসেন এবং শান্তিজল পান করেন।

নবকলেবর অনুষ্ঠানের মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্মের এক সার সত্যই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গণে বিষাদিত অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার স্বরূপ ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— 'মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে আবার নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা ও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ আশ্রয় করেন।' শ্রীভগবান আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মহীন, ক্ষয়হীন বলে জ্ঞান রূপে জানতে বলেছিলেন।

মানুষের যেমন দেহের নাশ আছে, শ্রীজগন্নাথদেবও তাঁর পুরাতন শরীর স্বরূপ শ্রীবিগ্রহকে ত্যাগ করেন। নতুন বিগ্রহ ধারণ করেন, কিন্তু আত্মা তো নিত্য, শাশ্বত। তাই আত্মা স্বরূপ ব্রহ্ম পুরাতন, পরিত্যক্ত বিগ্রহ থেকে নবকলেবরে পুনঃস্থাপিত হন। যিনি জগন্নাথ জগদীশ্বর, যাঁর ইচ্ছায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ঘটে, মর্ত্য জগতে আবির্ভূত হয়ে মর্ত্যের নিয়ম মেনে তিনিও দেহত্যাগ করেন! লীলাময় জগন্নাথের এ এক অপরূপ লীলা। আমরা সেই লালাময় ভগবানের জয়ধ্বনি দিই। প্রার্থনা করি, 'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'। ■

মাহেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত রথযাত্রা

সপ্তর্ষি ঘোষ

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের একটি অন্যতম প্রধান উৎসব রথযাত্রা। হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে মাহেশের রথযাত্রা উৎসবের খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। পুরীর পর আর কোথাও রথের মেলায় এত ভিড় হয় না। জনশ্রুতি, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধক ছয় শতাধিক বছর আগে মাহেশে গঙ্গাতীরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার তিনটি বিগ্রহ পেয়েছিলেন। বিগ্রহগুলি পাওয়ার পর তিনি তিনটি বিগ্রহকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন কথিত আছে, তীর্থভ্রমণ করতে স্বামী ধ্রুবানন্দ একবার পুরীধামে যান। সেখানে তাঁর বাসনা হয় নিজ হাতে জগন্নাথদেবকে অন্নভোগ নিবেদন করার। তাঁর বাসনার কথা শুনে তদানীন্তন মন্দিরের সেবায়েতরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন এবং ধ্রুবানন্দকে অপমান করেন। পাণ্ডাদের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে অভিমানী ধ্রুবানন্দ প্রতিজ্ঞা করেন, এই জীবন তিনি আর রাখবেন না, মহাপ্রভুর চরণে আত্মবলি দেবেন। এই বলে তিনি অন্নজল ত্যাগ করে উপবাস শুরু করেন। এইভাবে তৃতীয় দিন গভীর রাত্রে ধ্রুবানন্দকে জগন্নাথদেব স্বপ্নে দেখা দেন ও আদেশ করেন— 'দুঃখ করো না, বাংলাদেশের মাহেশ ধামে যাও। সেখানে গঙ্গায় ভাসমান নিমকাঠের সন্ধান পাবে। ওই নিমকাঠ দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করে পুজো করবে, তাতেই আমি তৃপ্ত হব'।

সেই অনুসারে ধ্রুবানন্দ মাহেশে ফিরে আসেন ও স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী গঙ্গায় ভাসমান কাঠের দেখা পান। সেই দিয়ে তিনটি বিগ্রহ তৈরি করে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটির স্থাপন করে সাধন ভজন শুরু করেন। এভাবে অতিবাহিত হয় বহু বছর। ধ্রুবানন্দের জীবন সায়াহ্নে নীলাচলে যাবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব মাহেশে জগন্নাথদেব দর্শন করতে আসেন। সেই সময় ধ্রুবানন্দ শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ করেন জগন্নাথ সেবার ভার গ্রহণ করতে। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে চৈতন্যদেব তাঁর অনুগামী কমলাকর পিপ্‌লাই-এর হাতে জগন্নাথ সেবার ভার অর্পণ করেন। তদবধি কমলাকরের বংশধরেরা মাহেশে জগন্নাথ সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

জগন্নাথদেবের প্রথম রথটি তৈরি করে দিয়েছিলেন বৈদ্যবাটির এক ধর্মপ্রাণ মোদক। সেই রথ ভেঙে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদ বলরাম বসুর পিতামহ কৃষ্ণরাম বসু ১২৯২ বঙ্গাব্দে ২০ হাজার টাকা ব্যয় করে লৌহরথ নির্মাণ করে জগন্নাথদেবকে উৎসর্গ করেন এবং রথ টানার জন্য রাস্তাও তৈরি করে দেন। চারতলা রথে অঙ্কিত রয়েছে অসংখ্য দেবদেবীর ছবি। ৯টি চূড়া এবং ১২টি চাকা আছে রথে। বসু পরিবারের বংশধররাই মাহেশের রথের যাবতীয় খরচ আজও বহন করে চলেছেন।

রথের রশি স্পর্শ করলে বা রথে আসীন জগন্নাথবেদকে দর্শন করলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না— এই বিশ্বাসে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসেন মাহেশে।

তথ্যসূত্র :

১। এই বাংলায়— প্রণবেশ চক্রবর্তী।
২। হুগলী জেলার দেব-দেউল— সুধীর কুমার মিত্র।
৩। সংবাদ প্রতিদিন— ৪ জুলাই ১৯৯৭।
৪। সৌমেন অধিকারী, সম্পাদক জগন্নাথ জিউ ট্রাস্টি বোর্ড।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

গাছের কথা

জগদীশচন্দ্র বসু

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনোদিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়?

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোনও গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বল তো—এই গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে; আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষ-শিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাক্না; তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোট, কোনোটি বড়। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড় হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোট

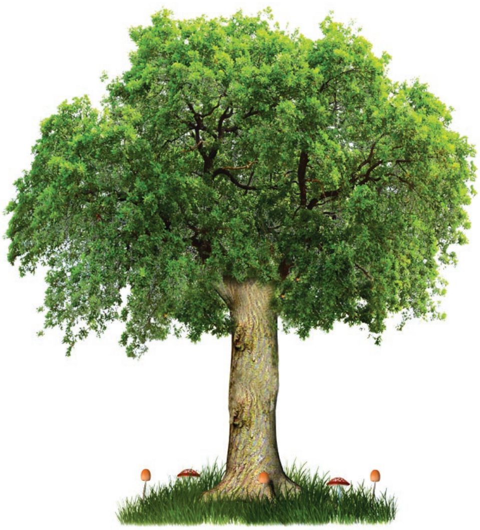

বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়ত কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছ-পালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল-ফুল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন-রাত্রি দেশ-দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই। যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাক্না গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড় ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোট ছোট ডাল ছিঁড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিন-রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধুলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাইরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল। (সংক্ষেপিত) ■

মনীষী কথা

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

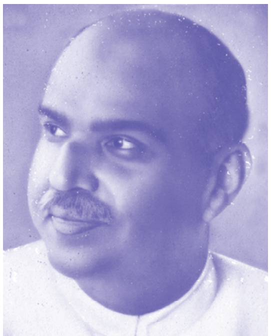

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০১ সালের ৬ জুলাই। কলকাতার ভবানীপুরে। বাবার নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বাবার অনেক গুণ পেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তাই লোকে বলত 'বাপকা বেটা'। শ্যামাপ্রসাদ খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। তারপর যোগ দেন রাজনীতিতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার কাশ্মীর রাজ্যের জন্য আলাদা একটি আইন তৈরি করে। তিনি তার বিরোধিতা করে কাশ্মীর যাত্রা করেন। তারপরে অসুস্থ হয়ে সেখানেই মারা যান। কিন্তু একথা কেউ বিশ্বাস করে না। সবার সন্দেহ তাকে সেখানে মারা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শহীদ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

প্রশ্নবাণ

১.ভারতের সবচেয়ে উঁচু রেল স্টেশন কোন্‌টি?

২.বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ অরণ্যের নাম কী?

৩.বিষ্ণুপুরে কোন্ শৈলীর মন্দির দেখা যায়?

৪.গঙ্গার উৎপত্তি ও মোহনা কোথায়?

৫.টয় ট্রেনের আসল নাম কী?

উত্তর : ১. ঘুম। ২. সুন্দরবন। ৩. টেরাকোটা। ৪. গঙ্গোত্রী ও বঙ্গোপসাগর ৫. দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েজ।

ছবিতে অমিল খোঁজ

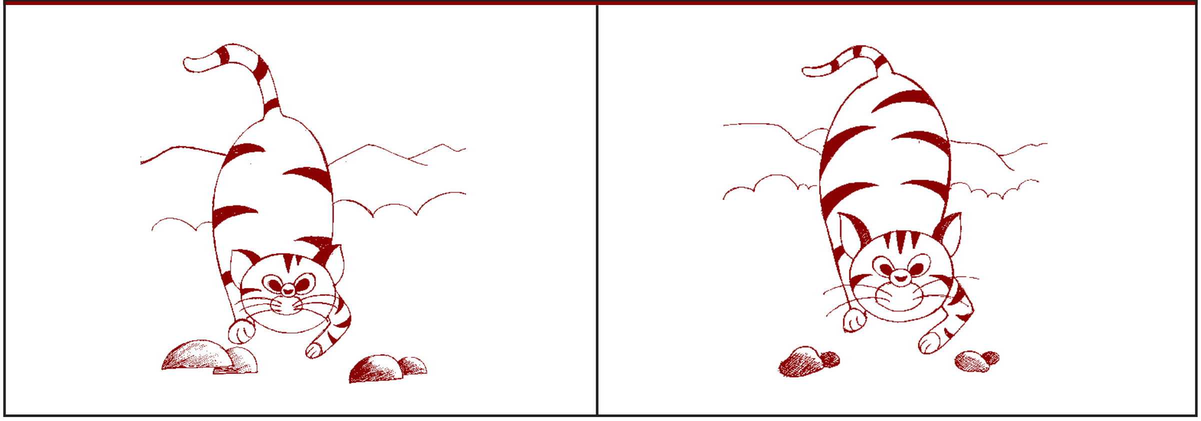

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) শা ল ং ম

(২) ব দি বা দে

২৯ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) শশব্যস্ত (২) চাঁদমামা

উত্তরদাতার নাম

সুস্মিতা রায়, কলকাতা-৬

সাগর চক্রবর্তী, মালঞ্চ, দ: দিনাজপুর

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) চ হ ত ত কি

(২) র র্শ দূ ন দ

২৯ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) কথামালা (২) পুরুলিয়া

উত্তরদাতার নাম

অনুশ্রী হালদার, কলকাতা -৪৬

প্রিয়ম সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

গায়ের রং মেয়েদের ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি নয়

শবরী ঘোষ

কোনো মেয়ের গাত্রবর্ণ কালো বা শ্যামবর্ণ হলে আজও আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজে তাকে বিভিন্ন কারণে অপদস্থ হতে হয়। বিয়ের ‘বাজারে’ কোনো দিনই কালো মেয়ের বিশেষ কদর নেই। পাত্রপাত্রী কলমে আজও পাত্রপক্ষের ‘কেবল ফর্সা সুন্দরী বিবেচ্য’ অথবা ‘গৌরবর্ণা ব্যতীত যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন’ জাতীয় বিজ্ঞাপন প্রায়শই চোখে পড়ে। এমনকী কোনো কোনো সংস্থার রিসেপশনিস্ট জাতীয় চাকুরির বিজ্ঞপ্তিতেও আবেদনপ্রার্থীর যোগ্যতামানের ক্ষেত্রে ‘স্মার্ট, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় সাবলীলতা’র পাশাপাশি ‘ফেয়ার অ্যান্ড বিউটিফুল’ চেহারাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে বাজারে এসেছে রাতারাতি গায়ের রং ফর্সা করার চটকদার ক্রিমের বিজ্ঞাপন।

কিন্তু গায়ের রং কি কোনো মহিলার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত মানদণ্ড হতে পারে? প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায়, মহাভারতের দ্রৌপদী থেকে শুরু করে মেঘদূতের যক্ষিণী— এদের প্রত্যেকের গাত্রবর্ণ কিন্তু শ্যামলাই ছিল। পাঞ্চালদুহিতা কৃষ্ণা ছিলেন সে যুগের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী। তাছাড়া সত্যবতী এবং ভীমের অন্যতমা স্ত্রী কালীও ছিলেন শ্যামাঙ্গী। প্রাচীন সাহিত্যিকদের কাছে সৌন্দর্যের চাবিকাঠি নারীর গাত্রবর্ণে নয়, তার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিহিত ছিল। তাই একজন প্রাক্তন বিশ্ব-সুন্দরী ও জনপ্রিয় অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম, শুধুমাত্র গায়ের রং ফর্সা না হওয়ার জন্য বহু প্রযোজক-পরিচালক তাঁকে অভিনয় করার সুযোগ দিতে চাননি, তখন মর্মাহত হয়েছিলাম বই কী!

একটি সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে, বর্তমানে ভারতে ৭৩টি ব্র্যান্ডের ফর্সা হওয়ার ক্রিম জনপ্রিয়। ২০০৫ সালে আত্মপ্রকাশ করা এমন একটি ব্র্যান্ড নাকি এক দশকের মধ্যেই ২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে। নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই এই জাতীয় ক্রিমের চাহিদা রয়েছে। বলাই বাহুল্য, নারী-ক্রেতার সংখ্যা এখানে পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো যে, কোনো ক্রিম মেখেই গাত্রবর্ণ পাল্টানো সম্ভব নয়। উপরন্তু ত্বক ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা সাবধান করেছেন

অঙ্গনা

যে, অনেক সময় এই ধরনের ক্রিমে স্টেরয়েড, হাইড্রোকুইনন অথবা ট্রেটিনয়েন জাতীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়। এগুলি ব্যবহার করলে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ হতে পারে বা মুখ পুড়ে অথবা ঝলসে যেতে পারে। এমনকী যকৃতের সমস্যা অথবা ত্বক-ক্যান্সারের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং বিজ্ঞাপনের ফাঁদে না পড়াটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

কোনো মানুষের ব্যক্তিত্বের যে বিশেষ গুণগুলি অপরকে আকর্ষণ করে তা হলো তার বুদ্ধিদীপ্ততা, ভদ্রতা, বিনয়, দৃঢ়তা, ধৈর্য, ঔদার্য, সহনশীলতা, মননশীলতা প্রভৃতি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপের জৌলুস চলে যেতে পারে। যা থেকে যাবে তা হলো ব্যক্তিত্বের জৌলুস। ‘পহলে দর্শনধারী পিছে গুণবিচারী’ এই প্রবাদটি যথেষ্ট প্রচলিত। কিন্তু রূপের প্রাথমিক মুগ্ধতার রেশ মুছে গেলেও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ আমাদের চিরকাল আচ্ছন্ন করে রাখবে।

তাই গায়ের রং কালো— এই নিয়ে দুঃখ পাওয়া বা অবসাদে ভোগা কখনোই উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর ও প্রকৃতিদত্ত কোনো না কোনো গুণ রয়েছে। নিজের সেই বিশেষ গুণটিকে খুঁজে নিয়ে তার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা প্রত্যেকেরই উচিত। পি টি ঊষা অথবা দীপিকা পল্লিকলকে কিন্তু কেউ তাঁদের গায়ের রং দিয়ে বিচার করে না। তাঁরা যেভাবে জগৎ সভায় নিজেদের প্রতিভার আলোয় ভারতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই প্রতিভাই তাঁদের একমাত্র পরিচয়। পাশাপাশি পাত্রপক্ষের ভাবা উচিত, গায়ের রং দিয়ে বিচার না করে একটি মেয়ের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী দিয়ে যদি তার মূল্যায়ন করা হয় তবেই উভয়পক্ষের মঙ্গল।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে মা কালী অথবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হয়। দু’জনেই শ্যামবর্ণ। কাজেই গায়ের রং কালো বলে যদি কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অপমান করা হয় তবে তা কিন্তু ঈশ্বরেরই অপমান। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

প্রতিকপি ১০ টাকা

অভ্যন্তরীণ নজরদারিই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

অতিথি কলম

রাম মাধব

আমার মতো একজন দশমবর্ষীয় বালকের কাছে 'জরুরি অবস্থা' আলাদা কোনো অর্থ বহন করে আনত না, যদি না আমার বাবা তখন মেইনটেইনেসাস অব ইন্টারনাল সিকিউরিট অ্যাক্ট (মিসা)'-এ বন্দী হয়ে কারান্তরিত হতেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন তিনি গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘ ২১ মাস কারান্তরালে থাকেন। আমি খুব ভালোভাবে মনে করতে পারি সেইসব দিনের কথা যখন আমি আমার মা'র সঙ্গে প্রত্যেক পনের দিন অন্তর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তিনি ছিলেন জনসঙ্ঘের একজন নেতা। বাবাকে দেখতাম জেলে সবসময়েই বেশ উদ্দীপনা ও প্রফুল্লচিত্তেই থাকতেন। জেলে বাবার সঙ্গে তাঁর দলের অন্য নেতারা এবং অন্য দলের নেতারাও ছিলেন। এছাড়াও এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুলস্'-এর আওতাভুক্ত হয়ে নিয়মিত ব্যবধানে জেলে আসতেন।

মনে হয় তখন জেলের ভেতরকার জীবনযাত্রা অত কঠোর ছিল না। বিশেষ করে মিসা'য় আটক বয়স্ক বন্দীদের সঙ্গে, কিন্তু সেলের বাইরের জীবন ছিল খুব কঠিন। মাঝেমধ্যেই মা'কে বলতে শুনতাম জেলের বাইরে তাঁর পক্ষে জীবনযাপন করা জেলের ভেতর বাবার জীবনযাপনের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তাই এর প্রধান কারণ ছিল না। মূল কারণ ছিল ভয়। জরুরি অবস্থা তীব্র ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে নিজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবরা বন্দীদের পরিবারকে এড়িয়ে চলত। যদি তারা এড়িয়ে না চলত তাহলে পুলিশ এটা নিশ্চিত করত যাতে তারা বন্দী পরিজনদের এড়িয়ে চলে, না হলে পুলিশি হয়রানির মুখে পড়তে হোত। কিন্তু ব্যতিক্রমী আর এস এস কার্যকর্তারা তাঁরা গোপনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁরা ছাড়া আর কেউ তখন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। দীর্ঘ দু' বছর আমরা সামাজিকভাবে একঘরে ছিলাম। এই ভীতিই জরুরি অবস্থার মূল ভিত্তি ছিল। জরুরি অবস্থার যেসব সাফল্যের কথা লেখা হয় যেমন ঠিক সময়ে ট্রেন চালানো বা সরকারি অফিসে ঠিক সময়ে হাজিরা ও কাজের সঠিক অগ্রগতি সবই এই ভীতির পরিণাম।

আজ আমরা যখন জরুরি অবস্থার প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে কথা বলি তখন এ কথা ভুললে চলবে না যে কী প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বিপক্ষকে চুপ করাবার জন্য। সারা দেশ ২১ মাস যাবৎ এক ভীতির কারাগারে বন্দী ছিল।

মহারাষ্ট্রের পুণায় ইয়ারবডা জেল। এখানেই আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস কারাবন্দী ছিলেন।

দিল্লীর তুর্কমান গেট— জরুরি অবস্থার সাক্ষী।

কেউ কেউ এখনও সেই ভীতির কৌশলের কথা ভোলেননি। তৎকালীন দেশবাসীর মানসিকতাকে ব্যাখ্যা করে লালকৃষ্ণ আদবানীর বিখ্যাত উক্তি— ‘‘যখন ঝুঁকতে বলা হোত তখন তারা হামাগুড়ি দিত’’। একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

জরুরি অবস্থা সম্ভবত কোনোদিনই ফিরে আসবে না। তখন যাঁরা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরাই আজ ক্ষমতায় এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার ব্যাপারে তাঁদের দায়বদ্ধতা প্রশ্নাতীত। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন সংবাদমাধ্যম, বিচারব্যবস্থা এবং সামাজিক সংগঠনের ক্ষমতা চার দশক আগের থেকে আজ অনেক বেশি। এছাড়া প্রযুক্তিও আজ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে এক বড় ভূমিকা নিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী এমন এক সময়ে জরুরি অবস্থা জারি করতে পেরেছিলেন যখন মিডিয়া নিয়ন্ত্রণে ছিল। আজ সোশ্যাল মিডিয়া’র মাধ্যমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত এবং কাউকেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তখন যাঁরা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন যেমন আর এস এস কর্মীরা তাঁদের যোগাযোগের অন্য মাধ্যম নিয়ে লড়তে হয়েছিল, এখন ব্যাপারটা অনেক সহজ। কাজেই জরুরি অবস্থায় প্রত্যাবর্তন এখন অসম্ভব।

তবে সেই ভীতি ফিরে আসতে পারে এবং সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে কাজে লাগিয়েই। যেমন ইন্দিরা গান্ধী করেছিলেন সংবিধানের অপব্যবহার করে কুখ্যাত ৪২ তম সংশোধন।

গণতন্ত্র স্বাধীনতার পরিপন্থী হতে পারে তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই। ফরিদ জাকারিয়া তাঁর বই ‘স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ’-এ লিখেছেন--- ‘বিশ্ব জুড়েই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অপব্যবহারের দ্বারাই স্বাধীনতার বিলোপসাধন হচ্ছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ব্যক্তিরা তাঁদের সাংবিধানিক সীমা অতিক্রম করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করছেন। পেরু থেকে প্যালেস্টাইন, ঘানা থেকে ভেনেজুয়েলা সর্বত্রই এটা হচ্ছে। তিনি বলেছেন— একে বলা যায় স্বাধীনতাহীন গণতন্ত্র।

জরুরি অবস্থা না ফিরলেও অন্য রূপে ফিরতে পারে। আমাদের সংবিধান যা চল্লিশের দশকের শেষের দিকের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিকতার ফসল তা সাক্ষ্য দেয় যে আমাদের স্বাধীনতা কষ্টার্জিত। সংবিধান ও বিচার-বিভাগ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ ননী পালকিওয়ালা বলেন, ‘সংবিধান তৈরি হয়েছিল এমন এক মুহূর্তকে সাক্ষী রেখে যখন আইনের শাসনের জীবনীশক্তির দ্বারা নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ভারতে আমাদের বর্তমান সময়ের পরেও বেঁচে থাকতে পারে এবং যখন আমাদের স্থান আমাদের চিনবে না তখনও টিকে থাকতে পারে।

তিনি একথা বলে সতর্কও করেছেন যে, একমাত্র জনগণের অসতর্কতাই এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর ধ্বংসের কারণ হতে পারে। ঊনবিংশ শতকের আমেরিকান বিচার-বিশেষজ্ঞ জোসেফ স্টোরি’র বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, সংবিধান চিরকালীন হওয়ার জন্যই রচিত হয়েছে, যদি না তা তার বাহকদের পতন, দুর্নীতি অথবা অসতর্কতার দ্বারা ধূলিসাৎ না হয়।

হেরোডোটাস-এর সময়ে গণতন্ত্রে বলতে বোঝানো হোত জনগণের শাসন। আজকের যুগে গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। আমাদের স্বাধীনতা হরণ করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতন থাকতে হবে। তার জন্য এমন নেতৃবর্গের প্রয়োজন যাঁরা ফরাসি বিপ্লবের তিনটি মন্ত্র--- সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির দিকে চোখ বোলালে বোঝা যাবে বিজেপি-ই একমাত্র দল যারা গণতান্ত্রিক ভাবে চলে। বাকি সবকটি দলই হয় পরিবারতান্ত্রিক নয় সামন্ততান্ত্রিক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী’র কর্মকাণ্ড দেখিয়ে দেয় তিনি স্বাধীনতার মূল্যের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ। এছাড়াও তাঁর নানা কাজ যেমন ‘মন কা বাত’, তাঁর সংসদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দেখিয়ে দেয় তাঁর অধীনে গণতন্ত্র কতটা সুরক্ষিত।

শেষাবধি একটি কথাই বলা যায়--- ‘অভ্যন্তরীণ নজরদারিই স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ।’

(লেখক বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক)

রাজনীতিতে টিকে থাকতে সিপিএমের সুবিধাবাদী কৌশল

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সম্প্রতি কলকাতা পুর নির্বাচনে যৎকিঞ্চিৎ ভোট বৃদ্ধির ইঙ্গিতে রক্তাল্পতায় ভোগা সিপিএমে কিঞ্চিৎ সক্রিয়তা প্রদর্শিত হচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবে পার্টির ঝানু কমরেডরা যাঁদের গরিষ্ঠাংশই ভোট বিশারদ বা ভোট ভাগাভাগি বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আওতায় থাকা ভোট কোন ভেল্কিতে নিজের দিকে আনা যায় ইত্যাদি জরুরি বিষয়ে এম ফিল বা পিএইচডি করে বসে আছেন। তবে বিগত ২০০৯ সাল থেকে শেষ পুর নির্বাচন অবধি এই সব ভোট গবেষকদের হাতে কোনো কাজ নেই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কেরলেও দল চরম বিড়ম্বনায় পড়েছে। উপনির্বাচনে বিজেপি'র ভোট ১৭ শতাংশ বেড়েছে। তা সিপিএমের ৯ ও কংগ্রেসের ৭ শতাংশ দখল করেই। ২০০৮ সালে পরমাণু চুক্তি সমর্থনের ক্ষেত্রে প্রকাশ কারাতের অবিমৃশ্যকারিতায় ২০০৯ সালে যে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের আচমকা জন্ম হয় তার ঠেলা শুরু হয় সেই লোকসভা ভোটেই। ২০১১'র বিধানসভায় তা পরিণত হয় ধাক্কায়। আর ২০১৪-র নরেন্দ্র মোদী ঝড় তাদের ভারতীয় রাজনীতিতে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে মাঠের বাইরেই করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় এখন তাদের ২ জন সাংসদ আছেন। অথচ দশ বছর আগেও সবমিলে বামপন্থী জোট ৬৬ জন সাংসদ পাঠাতে পেরেছিল যা সর্বকালীন রেকর্ড। এই ক্রমিক ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতেই দলের বাচাল বা কিছুটা স্নায়ুরোগাক্রান্ত রাজ্য কমিটির সদস্য ও সম্প্রতি বিধানসভায় পরাজিত হতমান গৌতম দেব হঠাৎই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার ভাবনা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়েছেন। এই ঘোষণার কিছু পরে পরেই তিনি মুকুল রায়ের জন্যও খিড়কি খোলার প্রস্তাব বিবেচনাধীন রাখতে বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভোট যা সিপিএম দলের একমাত্র ও অভিন্ন লক্ষ্য ও নানান গবেষকের আরাধ্য বিষয় তা নিয়ে এমন ভারী ভারী কথা দলের সদর দপ্তরে বসে রাজ্য সম্পাদক বিমানবাবু কেন উচ্চারণ করছেন না? তবে কি গৌতমবাবু স্বয়ম্ভু হয়ে আজ একটা কাল একটা প্রস্তাব ছুঁড়ে দিচ্ছেন। ব্যাপারটা হয়ত তা নয়, গৌতমবাবুর বাচালতার সুযোগে দল হয়ত ভাবনাগুলি বাজিয়ে দেখছে। অবস্থা বা প্রতিক্রিয়া অনুকূল না হলে গৌতমবাবুর ব্যক্তিগত মত বলে বাতিল করা যেতে পারবে। যদিও সিপিএমের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ দলে (যার হয়ত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই) এমন ব্যক্তিগত মর্জি অনুযায়ী ও পদাধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা ক্ষেত্রে অতীতে সাসপেন্ড হওয়াই ছিল প্রত্যাশিত প্রাপ্তি। রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর এই চটজলদি সঙ্কেতের পার্শ্ব- প্রতিক্রিয়াও অতি দ্রুত হয়েছে। সবং-য়ের কংগ্রেস নেতা এখন আর তাঁর আসনটি নিয়ে সম্ভবত আদৌ নিশ্চিত নন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলেছেন কংগ্রেস- সিপিএম সমঝোতা হলে তিনি তৃণমূলে যোগ দেবেন। একজন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি যিনি উঠতে বসতে কংগ্রেস শতবর্ষের অধিক প্রাচীন দল বলে বুক বাজাতেন কেমন অবলীলায় তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার ক্ষেত্রে দলীয় আদর্শকে পদাঘাত করতে পারেন! পাকা কথাই হলো না তিনি কংগ্রেস ছাড়ার আভাস দিলেন। এ যেন বিয়ে না হতেই সাধভক্ষণ!

আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শাসন হিটলারের হাজার বছরের রাইস প্রতিষ্ঠার মতো নিরঙ্কুশ করতে কোনো কিছুরই কসুর

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat
How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES
"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street,
Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

করবেন না তা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে চলেছেন। এই প্রতিবেদন লেখার দিন তাঁর ঠাঙাড়ে বাহিনী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে। সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কামদুনি, খাগড়াগড় হয়ে অগণন জায়গায় তাঁর অনুব্রত মণ্ডল, মনিরুদ্দিন, আরাবুল, শঙ্কুদেব, সোনালী গুহ পেশাগত গুণ্ডা বা গুণ্ডানীরা গোটা বাংলায় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এক মহাত্রাসের সঞ্চার করেছে।

এই বাতাবরণে কমরেডরা আজ ক্ষীয়মাণ, আতঙ্কিত, নির্জীব, নইলে রাজ্য কমিটির সদস্য ভোটের এক বছর আগে প্রকাশ্যে হার স্বীকার করে বলেন, 'দল একার ক্ষমতায় তৃণমূলকে হারাতে পারবে না। এখানে প্রশ্ন আসে রাজ্যে যে ক্ষমতা বদল হয়েছে তার মূল 'নহলে পে দহলা' হলো মুসলমান ভোট। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধাল যদি পরান্নে প্রতিপালনের মতো তাদের দিকে পড়ে থাকা তলানি ৩ বা ৪ শতাংশ ছিটকে আসে। পুরভোটের ২৫/২৬ শতাংশের সঙ্গে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ৪ শতাংশ যোগ হলে হয়ত ৩০ শতাংশ পেরোলে লড়াই-এ থাকা ভাবনায় আসতে পারে। এদিকে তাঁর দলে ভাঙনও প্রায় সূচিত হয়ে গেছে। রাজারহাটের পূর্ববর্তী পুরসভার প্রধান তাপস চট্টোপাধ্যায় সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই সব সাত পাঁচ ভেবেই বাঁচার তাগিদে 'বামফ্রন্টের বিকল্প একমাত্র উন্নতর বামফ্রন্টের' আস্ফালনকারী আর্তনাদের বিকল্প হিসেবেই কংগ্রেসের হাত ধরার পরিকল্পনা করছেন।

কিন্তু একটু পিছন ফিরে তাকালেই দেখা যাবে যেহেতু কংগ্রেস- তৃণমূল সমঝোতা ছিল না ২০০৪ সালে (তখনকার কংগ্রেস তুলনামূলকভাবে অনেক শক্তিশালী ছিল) ভোট ভাগাভাগির সহজ খেলায় অভ্যস্ত সিপিএমের 'কৌশল করিচু' সম্পাদক (যিনি কোনো নির্বাচন লড়েননি) লোকসভা ভোটের পূর্ণ ফলাফল প্রকাশের আগেই মাঝরাত্তিরে কংগ্রেসের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন। সেই নির্বাচনে বিজেপি-র সঙ্গে কংগ্রেসের আসনের তফাত ছিল ১৪টি। এরপর তিনিই কংগ্রেসের হয়ে প্রধান দালাল হিসেবে আরও ছোটখাটো দল জোগাড়ে নেমে পড়েন।

প্রবীণদের মনে পড়বে সঞ্জীব রেড্ডি-ভিভিগিরি-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পাশে ছিল সিপিএম। দেশের বিভিন্ন উৎকর্ষের নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বা পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত এন সি ই আরটি ও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রকের পদগুলি কংগ্রেস এঁদের হাতে কৃতজ্ঞ চিত্তে বিতরণ করত। আর এঁরাও সরকারে যোগদান না করেও কোনো দায়িত্ব ছাড়া সবরকম সরকারি আধা সরকারি সুযোগ সুবিধে ভোগে নিজেদের রপ্ত করে ফেলেন। আজ এঁদেরই বড় দুর্দিন। কথাটির সত্যতা বোঝাতে সদ্য বিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে আসা পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের পরিচালকের পদের ইতিহাসটি দেখুন— সর্বোচ্চ পদে বিগত ৪০ বছরে দু' একজন ছাড়া অধিকাংশই বামপন্থী প্রতিনিধি।

যাই হোক, কংগ্রেসের পর এক লহমায় বিক্ষুব্ধ সাংসদ মুকুল রায়ের এখনও ভূমিষ্ঠ না হওয়া দলকেও তিনি আগাম মান্যতা দিয়ে রাখলেন। সেই মুসলমান ভোট! অসুস্থ গৌতমবাবু অতীতে তাঁকে জেলে পুরতে তৎপর হলেও মুকুলের ইফতার পার্টিতে যে চার হাজার মুসলমান হাজির হয়েছিল তা তাঁর নজর এড়ায়নি। তাই এই বাড়তি কৌশল। তিনি বেশ জেনেছেন দল একা কিছু করতে পারবে না। আর মুকুলের মুসলমানি গুগলি যদি দিদি না সামলাতে পারেন তখন তার হাত ধরা সম্ভব। রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলমানদের ২৪/২৫ শতাংশই মমতাময়ীর হাতে। বাকি ভোট হিসেব এখন তুচ্ছ। সহজ হিসেব হিজাব আর মুয়াজ্জিন ভাতা। সব দাওয়াই ফেল হলে গৌতমবাবুদের ঝানু ভোট গবেষকরা এই হিজাব, ফেজ টুপি বা এতাবৎ শোনা যায়নি এমন কোনো ছেনতাই, রাহাজানি বা দাঙ্গা ভাতা দেওয়া পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেখতে পারেন। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা পেতে আজীবন অভ্যস্ত মুসলমানদের যদি মতিগতি পাল্টায়। ■

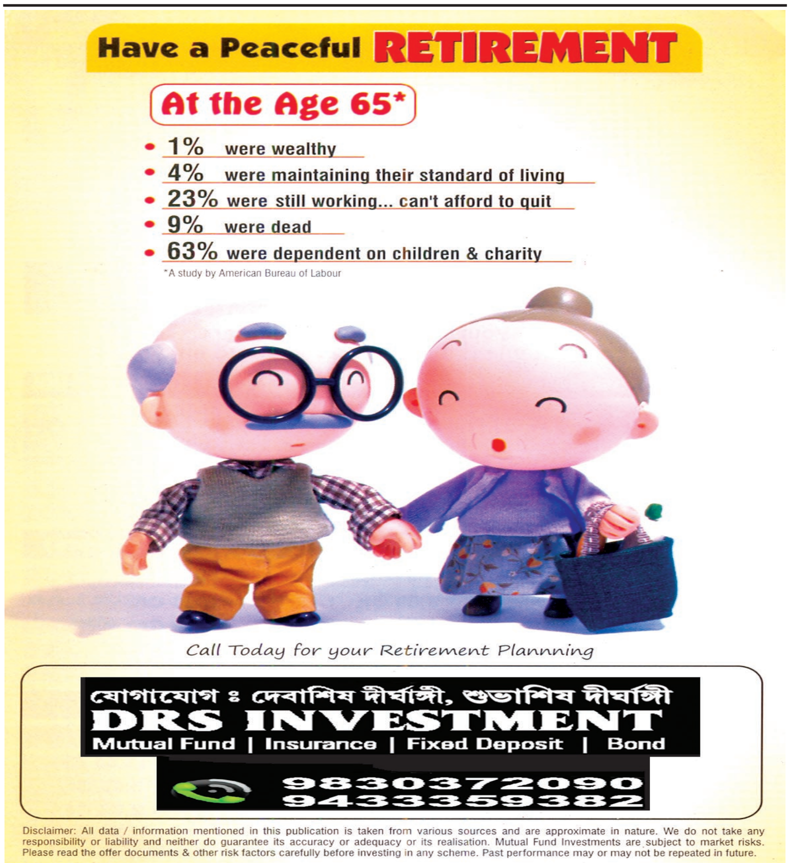

উল্টো বুঝলি রাম...

দেবাংশু ঘোড়াই

সরকারে আসীন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে বিভিন্ন রকম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি বা সংস্থার যোগাযোগের অভিযোগ এ দেশে নতুন নয়। ক্ষমতায় আসার আগে এবং পরে তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্ব ঠিক এই ক্ষেত্রেই অন্যান্য দলের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্যের দাবি জানিয়ে এসেছেন বারবার। আর ঠিক পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বাসার পর পরই আমরা দেখতে পেয়েছি সারদা কাণ্ডের মতো বড় রকমের আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা যা এখনও পর্যন্ত মহামান্য শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন। এছাড়াও এ রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়েও কমবেশি সকল বিনিয়োগকারীরাই বেশ সন্দিহান। কারণ আর কিছু নয়, লালফিতের বাঁধন। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্প মহলের একাংশ তাই নানা সময়ে সরব হয়েছেন। উচ্চ আসনে আসীন ব্যক্তিদের এই নিয়ে আলোচনা তো নিয়মিত চলছেই, এবার রাজ্যের উচ্চ আদালতও সেই নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে পিছপা হলেন না। যদিও সেই মন্তব্যও রাজ্যের শাসকদলের কাছে একপ্রকার নতুন ধরনের ব্যাখ্যা, যার বিরোধিতা করতে স্বয়ং শাসকদলের ছোট থেকে বড় হরেক রকমের কৌঁসুলিরাও বিরত থাকলেন না।

যদি এটা অন্যের মুখ থেকে শোনা কথা হোত তাহলে হয়ত আমিও এই ব্যাপারটাকে ততটা আমল দিতাম না, যেমনটা দিইনি কলকাতা হাইকোর্টে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া শাসকদলেরই অধীনে থাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের সিজ্ ওয়ার্ক ঘোষণা করার ব্যাপারে। ভাবখানা এরকম যেন প্রত্যেকেই অ্যামস্টারডাম বা সুইজারল্যান্ড থেকে নিয়মিত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে মামলা করতে আসেন, তাই তাঁরা গরম সহ্য করতে পারেন না। লজ্জা, এটা লজ্জা এই রাজ্যের সবথেকে বড় লজ্জা বোধ হয় সাম্প্রাতিককালের! আর তা নিয়ে সবকটি গণমাধ্যম যথেষ্ট সোচ্চার। কিন্তু তাতেও কোনোরকম ভ্রূক্ষেপ নেই এঁদের। যে যা বলে বলুক, ব্যাপারটা ঠিক ‘‘তোমার ডাকে সাড়া দিতে বয়েই গেছে...’’। যাইহোক, যেখানে ছিলাম আবার সেখানেই ফিরে আসি। গত ১৭ জুন, ২০১৫ তারিখে হাইকোর্টের রিসেসের পর এমপিএস গ্রুপের চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি চলছিল মহামান্য প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে। আমি স্বয়ং বসেছিলাম আমার সিনিয়র, সিনিয়ার অ্যাডভোকেট প্রতিক ধর মহাশয়ের সঙ্গে। যেহেতু চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর সাংবাদিক ও বিনিয়োগকারীদের ভিড় ছিল এই মামলার রায় শোনার জন্য। শুনানির সময় সরকার পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য ছিল যে, রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন কিছু বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আনার এবং তাঁদের দিয়ে এই রাজ্যে বিনিয়োগ করানোর। একবার বিনিয়োগ হতে শুরু করলেই সরকারপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ লোকেদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ঠিক সেই সময়েই বোমাটা ফাটে। প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর বলেন, ‘‘কে আসবেন এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে? বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তো দূরের কথা, কেরল বা কর্ণাটক থেকেও কেউ আসবেন না এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে...’’। শিল্পপ্রসার প্রসঙ্গে তেলেঙ্গানার তুলনা টেনে এনে বলেন, ‘‘কে এই পরিবেশে বাংলায় কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন?’’। তিনি আরও যোগ করেন, ‘‘তেলেঙ্গানায় কোনো বিনিয়োগকারী বিমানবন্দরে নামলে সেখান থেকে তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। শিল্পের জমি, পরিকাঠামো-সহ যাবতীয় বিষয়ে জানানো হয় শিল্পপতিকে। সব বিষয়ে সন্তুষ্ট হবার পর বিনিয়োগকারী সবুজ সঙ্কেত দিলে সরকারের পক্ষ থেকে ২১ দিনের মধ্যে সমস্ত বিষয়টা প্রস্তুত করে দেওয়া হয় শিল্পের জন্য।’’

যেহেতু আমি নিজে ওই এজলাসে উপস্থিত ছিলাম তাই হলফ করে বলতে পারি, এর বেশি প্রধান বিচারপতি কিছু বলেননি। আর তিনি যদি একথা বলেও থাকেন তাহলে একটু মাথা খাটালেই বোঝা যায় মহামান্য প্রধান বিচারপতি কিন্তু তাঁর নিজের স্বার্থে কিছু বলেননি, কারণ একে তিনি ভিন রাজ্যের মানুষ

তাতে আবার বিচারপতি হওয়ার দরুন তাঁর বদলির বরাত রয়েছে। সুতরাং, এই রাজ্যের কী উন্নতি হলো আর হলো না তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। কিন্তু বলতে বাধা নেই তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন অবিরত একটা পরিবর্তন আনার জন্য এই রাজ্যের বিচার ব্যবস্থায়। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। সিজ্ ওয়ার্কের সময় তিনি একথাও বলেছিলেন যে গাউন পরে না হোক আপনারা শুধু কোট পরে মামলা করুন, কিন্তু তাতেও আপত্তি। আসলে কাজ করার মানসিকতাটাই নষ্ট হয়ে গেছে যেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাজ্য সরকার বেশির ভাগ মামলাতেই হেরেছেন রাজ্যে শাসনে আসার পর। মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে এটাই মূল কারণ নয় তো কোর্টে কর্মবিরতি করে দেবার জন্য যাতে মামলাগুলোর শুনানি আরও পিছিয়ে যায়। তাতে আর কারুর মানে সাধারণ মানুষের লাভ হোক বা না হোক সরকারে আসীন মন্ত্রী বা আমলাদের তো হবেই।

পুরো ঘটনাটা এখানেই থেমে থাকেনি, ঠিক তাঁর পরপরই শাসকদলের গঠিত হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সরব হন এবং মুখ্য বিচারপতির সমালোচনা করতে ছাড়েন না এই বলে যে, ''মাননীয় প্রধান বিচারপতি এই রাজ্যের সম্পর্কে কুৎসা ছড়াচ্ছেন যাতে কোনো বিনিয়োগকারী বা শিল্পপতিরা না আসেন''। এরপরই এই খবর ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলিতে। ঠিক তার পরই রাজ্যের স্ট্যান্ডিং কাউনসিল প্রণব দত্ত বলেন, ''এমপিএস-এর মামলা চলাকালীন প্রধান বিচারপতির মন্তব্য ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন প্রেস ও তাঁদের সাংবাদিকরা। তাই আমি প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, ''তিনি স্বয়ং যেন জুডিশিয়াল নোটিশ পাঠান সমস্ত প্রেসগুলিকে তাঁর বক্তব্যের

বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর

ও পর্যবেক্ষণকে বিকৃত করার জন্য।'' এর প্রত্যুত্তরে মাননীয় প্রধান বিচারপতি জানান, ''আমি জানি আমি কি বলেছি, কেন বলেছি এবং কোনো পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি, সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন বিচারকদের সঙ্গে আমার বিভিন্ন সময়ে মিডিয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাই আমি সংবাদপত্র বা কোনো মিডিয়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না এবং কোনো মিডিয়াকেই কোনো রকমের নোটিশ জারি করব না''। এখানেই না থেমে তিনি আরও যোগ করেন এই বলে যে, ''আমি আমার কোনো মন্তব্যের জন্য কারুর কাছে কোনো ক্ল্যারিফিকেশন দেব না। আমি কখনই কোনোভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না। আর তাছাড়া কোনো বিনিয়োগকারী বা শিল্পপতি যদি এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আসতে চান তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের আমার দেওয়া কোনোরকম শংসাপত্রের প্রয়োজন পড়বে না''।

এইসব কথা চালাচালির পর স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের বিভিন্ন মহল বেশ কিছুটা শঙ্কিত কিন্তু মুশকিল হলো কিসের জন্য শঙ্কিত তা বোঝা যাচ্ছে না। আবার হলফ করে বলতে পারি মহামান্য প্রধান বিচারপতি কোনোভাবেই এই রাজ্যের অবনতি হোক একথা ভেবে বলেননি, বরং কী কী করলে শিল্প বা বিনিয়োগ আসবে তাই একরকম বকলমে বলে গেছেন। কিন্তু হায় রে আমাদের শাসকদলের বুদ্ধিজীবীরা, মাথায় বুদ্ধি থাকলে তো বুঝবি! তোদের যতই বোঝানো হোক না কেন তোরা যে আসলে উল্টো বুঝলি রামের দলের সভ্য, তোরা বুঝবি কী করে।

(লেখক কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জন্মান্ধ আই এফ এস বেনো জেফিন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১২ জুনের আগে পর্যন্ত তাঁকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একজন অফিসার হিসাবেই সকলে চিনত। কিন্তু ১২ তারিখের পর মানুষ তাঁকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে। বছর ২৫-এর জন্মান্ধ বেনো জেফিন ইউ পি এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রক দপ্তরে যোগদান করেছেন। ৬৯ বছরের ভারতের বিদেশমন্ত্রক দপ্তরে যা প্রথম।

চেন্নাইয়ের বাসিন্দা বেনো জেফিন এখন ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তরের একজন অফিসার। মাত্র ২৫ বছর বয়সে অসাধ্য সাধন করে যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন

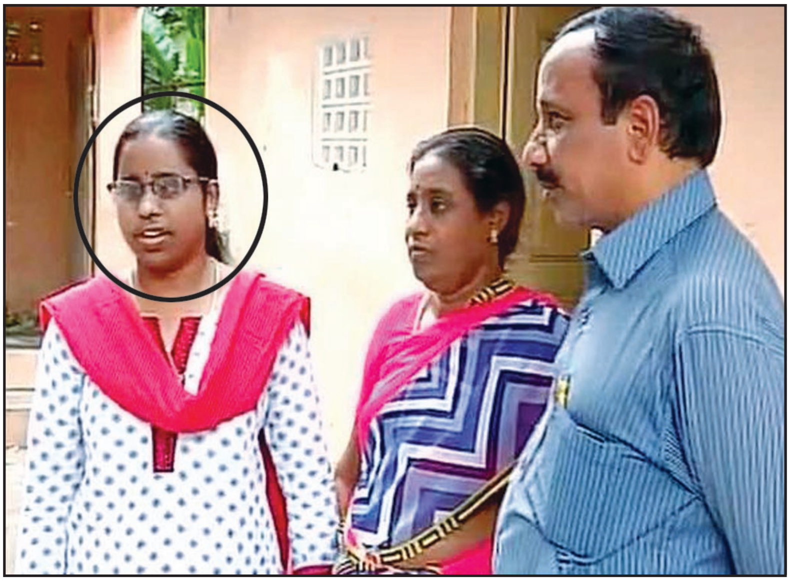

বাবা-মা'র সঙ্গে বেনো জেফিন।

তা এক কথায় নজিরবিহীন। প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে যে মনোবল নিয়ে তিনি এগিয়েছেন তাঁর সিংহভাগ কৃতিত্ব তিনি তাঁর বাবা-মাকে দিতে চান। কারণ রেলকর্মী বাবা জীবনে চলার পথে ছোট থেকেই তাঁকে সাহস যুগিয়ে এসেছেন। কখনই বুঝতে দেননি শারীরিক সমস্যার দিক থেকে আর পাঁচজনের থেকে সে পিছিয়ে। বরং বলতেন সরকারি উচ্চপদে তাঁকে বসতে হবে। একথা মাথায় রেখেই এগিয়েছেন বেনো। ব্রেইল পদ্ধতিতেই তাঁর পড়াশোনা। এইভাবেই তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে পোস্ট গ্রাজুয়েট হন। গ্রাজুয়েট হয়েই স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে যান। বাবা যেহেতু বলেছিলেন সরকারি উচ্চপদে বসতে হবে তাই তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের কাছে প্রতিবন্ধকতা হার মানতে বাধ্য হয়। ২০১৩ সালে ইউ পি এস সি পরীক্ষায় বসেন তিনি।

পরীক্ষায় তাঁর র‍্যাঙ্ক হয় ৩৪৩। বেনোর এই সাফল্যে সারাদেশে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কারণ যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গেলে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয় সেখানে একজন দৃষ্টিশক্তিহীন মেয়ে খুব অল্প বয়সেই ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস-এর মতো পদে নিযুক্ত হলেন। পরীক্ষায় বসার জন্য বেনো আই এ এস অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিতেন। প্রতিষ্ঠানের এম ডি জানান, ‘‘প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না বেনো তাঁর বাবাকে প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে বলতেন, বেনো তা একমনে শুনতেন।’’ শুধু সংবাদপত্রই নয়, সমস্ত বই ব্রেইল পদ্ধতিতে না থাকার জন্য মাকে সেই বই পড়তে বলতেন। তা শুনেই মনে রাখতেন বেনো।

তাঁর জীবনের অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্তটি হলো ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রক থেকে পাওয়া ফোন। ফোনেই তিনি নিশ্চিত হন যে আই এফ এস পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। মুহুর্মুহু বাজতে থাকে মোবাইল ফোন। হাজারো শুভেচ্ছাবার্তা। বাবাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি সফল হয়েছেন। ৬০ দিনের ট্রেনিংয়ে যাচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি অন্যদেরকে উৎসাহিতও করেছেন আগামী দিনে তারা কীভাবে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছবে। তামিলনাড়ু-সহ দক্ষিণ ভারত জুড়ে বেনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হচ্ছেন। তাঁর মতো শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ আজ সাধারণের আদর্শ। সব জায়গায় তিনি একটাই কথা বলছেন, ‘‘প্রতিবন্ধকতা জীবনে চলার পথে এবং নিজের স্বপ্নের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।’’

এই সাফল্যের আনন্দ তিনি পরিবার-পরিজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কারণ আগামীদিনে চলার পথে বেনোর সঙ্গী বলতে তো এখন এঁদেরই বোঝায়। বেনোর এই সাফল্যে তাঁর বাবা-মা নিজেদের গর্বিত বলে মনে করছেন। এবার তাঁরাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেয়ের সঙ্গী হয়ে দিল্লী যাওয়ার জন্য। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

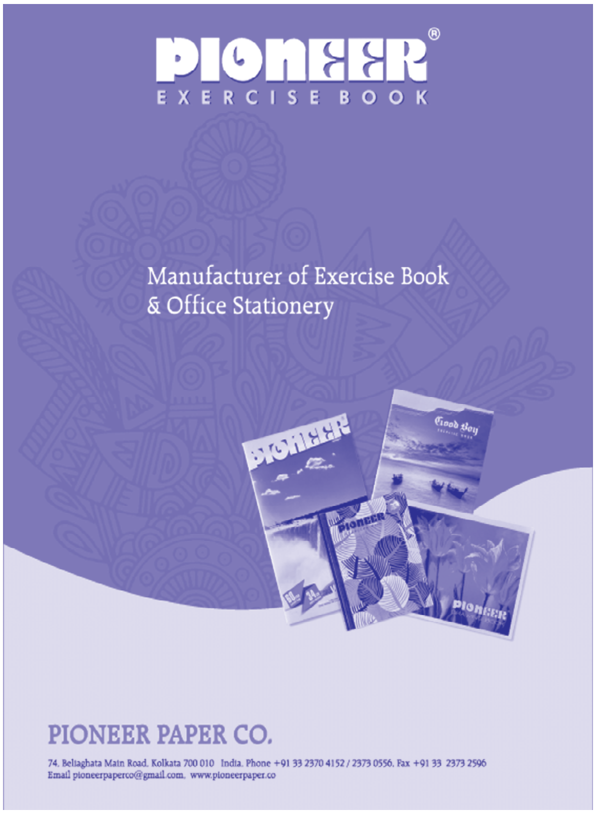

'স্ত্রীশিক্ষার বর্তমান অবস্থায় বিবিধ হস্তশিল্পের প্রচলন যথার্থই প্রয়োজন। কর্মদক্ষতা অর্জন না করে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন, কাজের পরিবর্তে কথা, কোন নূতন কর্মে অগ্রসর হওয়া ও তাতে লেগে থাকার শক্তি অপেক্ষা নিছক পরিকল্পনা করা— এতে শিক্ষার সম্পূর্ণ অবনতি ঘটবে।

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সমাবেশ সমাচার

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে ভাগবতকথা জ্ঞান যজ্ঞ

সারাদেশে বনবাসী সমাজের জন্য কার্যরত অখিল ভারতীয় কল্যাণ আশ্রম অনুমোদিত পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম কলকাতা ও হাওড়া মহানগর শাখার যৌথ উদ্যোগে গত ২১ জুন থেকে ২৮ জুন সপ্তাহব্যাপী 'ভাগবতকথা জ্ঞান যজ্ঞ' আয়োজিত হয় কলকাতার সল্টলেকে বিগবাজার ব্যাঙ্কয়েট হলে। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শত শত ভক্ত ভাগবত কথা শ্রবণ করেন। ভাগবত কথা শ্রবণ করান ছত্তিশগড় রাজ্যের বিলাসপুরের বালিকা কথাকার সুশ্রী বিজয়া উর্মলিয়া। বিজয়া উর্মলিয়ার পিতাও একজন প্রখ্যাত কথাকার। বাবার সঙ্গে থেকে উর্মলিয়াও প্রবচন দিতে শিখে যান। মাত্র ৮ বছর বয়সে সীতামঢ়ী গ্রামে

চণ্ডিকামাতা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে ১ সপ্তাহ ভাগবত কথা শুনিয়ে বালিকা কথাকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এখন পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে তিনি ১১০ টি ভাগবত কথা প্রবচন রেখেছেন। ছত্তিশগড়ের যশপুর বনবাসী এলাকায় ধর্মজাগরণের জন্য ১২৫ কিলোমিটার পদযাত্রা করেছেন। প্রবচন থেকে আয় তিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ব্যয় করেন।

কলকাতা ও হাওড়া মহানগর শাখা এই ভাগবত কথার দান থেকে সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে বনবাসী কন্যাছাত্রী নিবাস নির্মাণের যোজনা করেছে। বেশ কয়েক বছর আগে কল্যাণ আশ্রম সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে একটা ভাড়া বাড়িতে ১২ জন বালিকাকে নিয়ে প্রীতিলতা ছাত্রী নিবাস শুরু করে। ছাত্রী নিবাসের ছাত্রীদের সংস্কারপূর্ণ দিনচর্যা ও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে গোসাবা দ্বীপে ছাত্রীনিবাসের প্রতি স্থানীয় মানুষের আগ্রহ বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে প্রীতিলতা ছাত্রী নিবাস থেকে ২৮ জন বালিকা পড়াশুনা করছে। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার কল্যাণ আশ্রম কর্তৃপক্ষ ৪.২৫ বিঘা জমি কিনেছেন। এই জমিতেই ১০০ ছাত্রীর থাকার মতো ভবন নির্মাণের যোজনা তৈরি হয়েছে। ভাগবত কথা জ্ঞান যজ্ঞের উদ্যোক্তাদের আশা, ভাগবত কথা শুনতে আসা ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত দানে ভবন নির্মাণের অর্থ পাওয়া যাবে।

প্রথমদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা প্রকাশজী কল্যাণ আশ্রমের সেবাকাজের বিষয়ে সবাইকে অবগত করান। উপস্থিত ছিলেন কথা অধ্যক্ষ ললিত বেরিওয়াল, কথা সংরক্ষক হরিশ আগরওয়াল, উপধ্যক্ষা শ্রীমতী দময়ন্তী বিয়ানী, প্রধান অতিথি রমেশ নাঙ্গনিয়া, প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত ভট্টাচার্য ও প্রধান যজমান রাজেশ আগরওয়াল। এছাড়াও শঙ্করলাল আগরওয়াল, জিতেন চৌধুরী, শঙ্করলাল হাকিম, শ্রীমতী শকুন্তলা বাগড়ী, শ্রীমতী ঊষা আগরওয়াল, শ্রীমতী ইন্দু নাথানি, শ্রীমতী শশী আগরওয়াল এবং শ্রীমতী নির্মলা লাহৌটি উপস্থিত ছিলেন। প্রীতিলতা ছাত্রী নিবাসের ছাত্রীরা বৈদিক স্তোত্র পাঠ করে। ভাগবতকথা জ্ঞান যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, অখিল ভারতীয় সহসেবা প্রমুখ গুণবন্ত সিং কোঠারী, ক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল এবং প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ

গত ২৮ জুন হুগলী জেলার বলাগড়ে সচ্চিদানন্দ যোগাশ্রমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী পুরোহিতগণের মধ্যে ছিলেন ভারত সংস্কৃত পরিষদের পৌরোহিত্য প্রশিক্ষক পণ্ডিত সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শক্তিপদ চক্রবর্তী। ৫ জন পুরোহিত যজ্ঞে আহুতি প্রদানে অংশগ্রহণ করেন। পরিষদের স্থানীয় সদস্য ও দর্শনার্থী মিলিয়ে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ শর্মা, সুভদ্রা শর্মা, রেবা দাস, আচার্য কমলাকান্ত, তপন কুমার মুখার্জী, সুশীল ভট্টাচার্য, সুভাষ সাধুখাঁ, স্বামী তিতিক্ষানন্দ মহারাজ, স্বামী শিবাত্মানন্দ মহারাজ, পতিতপাবন দাস বাবাজী, সঙ্ঘের পক্ষ থেকে অভিজিৎ রায়চৌধুরী, মানিক ঘোষ, দেবাশিস হালদার, প্রদীপ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃতভারতীর সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

সংস্কৃতভারতীর দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির গত ১১ জুন থেকে ২০ জুন অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলার মায়াপুরধামের গৌরগোবিন্দ আশ্রমে। সম্ভাষণ শিবিরে ৩৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর কার্যকর্তা মিলন মাজী।

সমাপ্তি দিবসে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন গৌরহরি আশ্রমের পূজ্যপাদ ভারতী মহারাজ, প্রধান অতিথি হিসেবে ইসকন মন্দিরের পূজ্যপাদ পুরুষোত্তম মহারাজ এবং বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য। এছাড়া সংস্কৃত সংস্কৃতভারতী কলকাতা শাখার সম্পাদক সন্তু দত্ত উপস্থিত ছিলেন। গত ২৫ জুন থেকে বর্ধমান শহরে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি দিবসে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. গৌতম চন্দ্র। আরও উপস্থিত ছিলেন তপপ্রকাশ ভট্টাচার্য, সারদা আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দুর্গেশানন্দ মহারাজ। শিবিরে শিক্ষক রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সুবলসখা ব্রহ্মচারী। গত ২৯ জুন বর্ধমান জেলার পানাগড়ে কাংসা বালিকা বিদ্যালয়ের সভাগৃহে দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির হয়। ৫৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র। সমাপ্তি দিবসে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর সম্পাদক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, পানাগড় কালিকাশ্রমের আচার্য শ্যামাপদ রায়, পানাগড়ের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সন্দীপ আগরওয়াল প্রমুখ।

প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগের সংবর্ধনা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ নাগপুর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হলেন। গত মার্চ মাসে নাগপুরের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে তাঁর কেন্দ্র বদলের কথা ঘোষণা হয়। তিনি ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে সহপ্রাপ্ত প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে আসেন এবং ক্রমে অখিল ভারতীয়-সহ প্রচারক প্রমুখের দায়িত্ব ভারও গ্রহণ করেন।

বসে বাঁ দিক থেকে অদ্বৈতচরণ দত্ত, কেশবরাও দীক্ষিত, অজয় নন্দী ও শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ।

সঙ্ঘের প্রচারকদের নির্দিষ্ট কোনো স্থায়ী ঠিকানা থাকে না, সঙ্ঘ যেখানে যেমন দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়, তিনি সেখানে গিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করে থাকেন— এটাই সঙ্ঘের রীতি। শ্রীকৃষ্ণ মোতলগও সেই রীতি মেনেই নাগপুরে ফিরে গেলেন। মূলত তিনি সঙ্ঘের নাগপুর শাখার স্বয়ংসেবক। শিক্ষা জীবন অর্থাৎ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে স্বদেশ তথা হিন্দু সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। গত ২৫ জুন কলকাতায় কেশবভবনে এক সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তাঁর চলার পথে তিনি বহুজনের আশীর্বাদ ও স্নেহ লাভ করেছেন। নাগপুরে থাকলেও বাংলার কথা তাঁর মনে থাকবে এবং সময়-সুযোগ পেলেই তিনি বাংলায় আসবেন। বাংলার স্বয়ংসেবকদের পক্ষে তাঁর হাতে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ শাল ও ফল তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে কেশবরাও দীক্ষিত, রণেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

A Well Wisher

(Dr. P. S. Chakraborty)

‘শ্রদ্ধা’র ৬৪ তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৮ জুন সকালে বীরভূম জেলার চন্দ্রপুর থানার কয়ড়াবাদ গ্রামে ১০২ বৎসর বয়স্ক গ্রামের মোড়ল সোম হেমব্রমকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয় হেমব্রম পরিবারের ভদ্রাসনে। সোম হেমব্রমের নেতৃত্বে গ্রামের বনবাসী সমাজের আচার-বিচার ও বিবাহাদি অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। বনবাসী সমাজে তিনি মাঝিবাবা নামে খ্যাত। তিনি একজন বৃক্ষপ্রেমী। তিনি নিজ হাতে ২৮০ আমগাছ লাগিয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। শ্রদ্ধার পক্ষে তাঁকে দিয়ে একটি মেহগনি চারা লাগানো হয়। শ্রদ্ধার নিয়মানুসারে তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করা হয়। দীপ প্রজ্বলন করেন তাঁতিপাড়া গ্রামের প্রবীণ গ্রামবাসী ও শ্রদ্ধার অনুদানী অম্বুজাক্ষ দে। মাল্যদান করেন শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার (ছোটদা)। সোম হেমব্রমকে পা ধুইয়ে, তুলসী চন্দন ফুল দিয়ে পূজা করেন তুলসী চক্রবর্তী। উদ্বোধনী গীত পরিবেশন করেন শ্রদ্ধার অনুদানী শ্রীমতী বনানী চৌধুরী। শ্রীহেমব্রমের নাতনী শর্বরী হেমব্রম সাঁওতালি ভাষায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে অর্ঘ্যস্বরূপ গীতা, বস্ত্র, নামাবলী, ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। প্রাস্তবিক ভাষণ দেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রী চক্রবর্তী রামায়ণ-মহাভারত যুগ থেকে শিবাজী, মহারাণা প্রতাপ-সহ ভারতের বনবাসী সমাজের ধর্ম রক্ষার্থে সহযোগিতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। সোম হেমব্রমকে আরতি করেন শ্রদ্ধার অনুদানী শুভ্রা ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রায় গ্রামের শতাধিক বনবাসী উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাঁওতালি ও বাংলা ভাষায় সঞ্চলনা করেন পতিত পাবন বৈরাগ্য। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপর ভজন গেয়েছেন শ্রীমতী প্রীতিকণা ভট্টাচার্য। শান্তিমন্ত্র ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক সুনীল বিষ্ণু।

পরলোকে প্রচারক সোহন সিংহ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক সোহন সিংহ গত ৪ জুলাই ৯৩ বছর বয়সে দিল্লীর কেশবকুঞ্জে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রাজস্থান, দিল্লী, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরে প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি রাজস্থানেই প্রায় ২০ বছর প্রচারক জীবন কাটিয়েছেন। ‘পাথেয় কণ’ পত্রিকা প্রচার-প্রসারে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। সোহন সিংহজীর জন্ম উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর

জেলার ইর্চনা গ্রামে। ১৯৪৩ সালে প্রচারকরূপে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট, কারনাল, হরিয়ানায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ থেকে ৭৮ রাজস্থানে বিভাগ, সম্ভাগ ও প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০-০৪ উত্তরক্ষেত্র প্রচারক ছিলেন। এই মহান দেশভক্তকে শত শত প্রণাম।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৮ জুন কলকাতায় মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স সভাগৃহে একা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ ড. মনমোহন বৈদ্য বলেন, সংগঠিত সমাজই রাষ্ট্রের আত্মা। ডাঃ হেডগেওয়ার এই সত্য উপলব্ধি করেই হিন্দু সমাজ সংগঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্থার মার্গদর্শক যুগলকিশোর জৈথলিয়া ও অনুষ্ঠানের সভাপতি শার্দুল সিংহ। সম্পাদক মহাবীর বাজাজ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

থাকে যদি
'ডাটা',
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
TURMERIC
POWDER
50g
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

স্বমহিমায় বিশ্বনাথন আনন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতরত্ন বললে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না। বিশ্বনাথন আনন্দ সব অর্থেই বিশ্বরত্ন। যাঁর নামে নভোমণ্ডলে গ্রহাণুর নামকরণ হতে পারে তিনি তো বিশ্বজনীন। এতবড় দেশ ভারত, এত বড় বড় সব মহাত্মা মহাপুরুষ জন্মেছেন অথচ দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি এই কীর্তি গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। এই মহাজাগতিক স্বীকৃতির পরই যেন আনন্দ তাঁর হারিয়ে যাওয়া ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। সম্প্রতি নরওয়ে ওপেন দাবা টুর্নামেন্টে আনন্দ শুরুটা মোটেই আশাব্যাঞ্জক করেননি। ওপেনিং গেম ভাল হলেও মিডল গেমে খেই ও ভারসাম্য হারিয়ে কখনই নিজের খেলাকে প্রত্যাশিত উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারছিলেন না। কিন্তু টুর্নামেন্টের মাঝপর্বে এসে মনে হল তিনি কল্পলোকের নক্ষত্র। এই লোক সুপার গ্রান্ডমাস্টার। যাঁর ঝুলিতে আছে পাঁচটি বিশ্ব খেতাব, ছয়টি অস্কার পুরস্কার। তাঁর কী এভাবে টুর্নামেন্ট শেষ করা চলে!

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। যিনি পরপর দু' বছর বিশ্ব খেতাবি লড়াইয়ে ধরাশায়ী হয়েছেন নরওয়ের বিস্ময় প্রতিভা ম্যাগনাস কার্লসেনের কাছে এবার তাঁকে হারিয়ে পায়ের তলার জমি ফিরে পেলেন আনন্দ। মার্কিন ও রাশিয়ান গ্রান্ডমাস্টার হিকারু নাকামোতা এবং আলেকজান্ডার গ্রিসচুককে বিন্দুমাত্র সুযোগ দেননি পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ওপর আধিপত্য বিস্তারের। যাঁকে একবার হারিয়ে বিশ্ব খেতাব জিতেছিলেন শেষ রাউন্ডে তাঁকে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছেড়েছেন আনন্দ। এই টুর্নামেন্ট থেকেই যেন আনন্দের বিশ্ব খেতাবি লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জার হিসেবে উঠে আসার ভিতটি তৈরি হয়ে গেল বলে মনে করছেন দাবা তাত্ত্বিকরা।

গত এপ্রিলে নাসার এক আন্তর্জাতিক গবেষণাগারের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আনন্দের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি অদম্য কৌতূহল ও সৌরমণ্ডলের প্রতিটি বিষয় নিয়ে চর্চার খবর পেয়ে তাঁর নামে একটি নামগোত্রহীন গ্রহাণুর নামকরণ করেন। প্রসঙ্গত বলতে হয় ওই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও আবার দাবাভক্ত, আরো বেশি করে বললে আনন্দ প্রেমী। তাঁর আগে একমাত্র রাশিয়ার কিংবদন্তী দাবাড়ু আলেকজান্ডার আলেথিনের নামে এ ধরনের একটি গ্রহাণুর নামকরণ হয়েছিল। বিশ্বের সর্বকালের পাঁচ সেরা দাবাড়ুর অন্যতম বিশ্বনাথন আনন্দও আলেথিনের থিওরি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার স্ট্রাটেজিক মুভমেন্ট আদ্যোপান্ত গিলে খেয়েছেন। শুধু আলেথিন কেন, প্রথম যুগের ইমানুয়েল লাসকার থেকে হালের 'গ্রেট মাস্টার' গ্যারি কাসপারভের খেলার খুঁটিনাটি ও তাঁদের অনুসৃত 'গেম থিওরি' থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক দাবাড়ু হিসেবে গড়ে তুলেছেন আনন্দ।

বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক বহুমাত্রিক খেলায় দীর্ঘ দু' দশক নিজেকে শীর্ষ পর্যায়ে ধরে রেখেছেন বিশ্বনাথন আনন্দ। সেই ১৯৯১ সালে বিশ্ব ক্যান্ডিডেটস দাবায় চমক জাগিয়ে শুরু করে নিজের আগমনী বার্তা জানান দিয়ে যান বিশ্ববাসীকে। তারপরের ঘটনা সাফল্য ও কীর্তিকল্পের বিরামহীন পরিক্রমা। বিশ্বের সব ফর্মাটের দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতেছেন একাধিকবার। পাঁচটি ফিডে 'ক্লাসিক' বিশ্বখেতাবি চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা এই ওপেন যুগে কতটা অতিমাত্রিক ঘটনা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ববি ফিশার ও গ্যারিকাসপারভের সংমিশ্রণে তৈরি আনন্দ এই দুই চিরকালীন কিংবদন্তীর সঙ্গে 'হল অব ফেমে' অবস্থান করছেন এক উজ্জ্বল আলোকবৃত্ত হয়ে। আনন্দের উল্কার বেগে উত্থান এদেশে দাবার চালচিত্রটাই বদলে দিয়েছে।

গত কয়েক বছরে কত পুরুষ ও মহিলা গ্রান্ডমাস্টার তৈরি হয়েছে এদেশে। ভারত আজ বিশ্বদাবায় শক্তিধর দেশ হিসেবে পরিগণিত। বড় বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বাছাই তালিকায় স্থান পাচ্ছেন শশীকিরণ, হরিকৃষ্ণ, সূর্যশেখর গাঙ্গুলিরা। কোনেরু হাম্পি মহিলাদের বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে দু'বার ফাইনাল খেলেছেন। এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত আছে যা ভারতীয় দাবায় সফল আন্তর্জাতিকরণের দিকচিহ্ন তুলে ধরে। স্বামী বিবেকানন্দের ভারত আজ যোগাসন ও দাবার দৌলতে সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।■

শব্দরূপ-৭৫৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

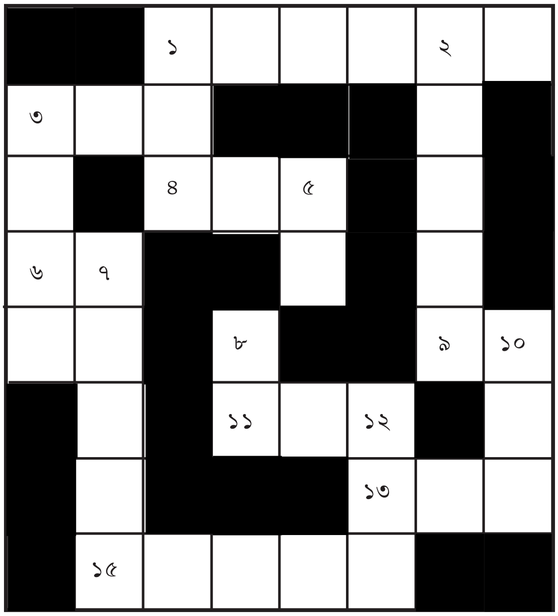

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** ব্রত বিশেষ, আহার বর্জন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপবেশন, **৩.** নীচজাতি, **৪.** যযাতির পিতা, **৬.** প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি, **৯.** উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ, **১১.** পুরাণোক্ত অগ্নিমুখী সমুদ্রঘোটকী, **১৩.** রুদ্রবীণা, **১৪.** আয়ুর্বেদোক্ত আসন্ন মৃত্যু-লক্ষণ।

উপর-নীচ : **১.** পাচনবাড়ি, পশুচালন দণ্ড, **২.** শবাসনে বসে তান্ত্রিক সাধনা বিশেষ, **৩.** স্বর্গের পরী, স্বর্গের নৃত্যশিল্পী, **৫.** সন্তানের রক্ষিত্রী দেবী, কৃত্তিকা, **৭.** শাস্ত্রোক্ত আদিমবারি, যাহা হতে জীবের উৎপত্তি হয়েছে, **৮.** কষায় রস ও আঠা বিশিষ্ট ফলবিশেষ, তিন্দুক, **১০.** অর্জুনের ধনু, **১২.** ''যদি—কর, গাহিব না'', নিষেধ হস্তী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কুমার
বাগমুন্ডি, পুরুলিয়া

অ	ছি	লা		অ	গ্র	দা	নী
ছি		ই	জ্জ	ত			
	ম	ন		নু	ড়	কু	ত
	ধু					ট	
	মে					মি	
অ	হ	মি	কা		মা	ত	
			মি	ছি	ল		না
ম	ন্দা	কি	নী		পো	লি	ও

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৫৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact

DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

শান্তির জন্য পেরুর সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য পেরুর সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্র্যান্ড অফিসার' পেলেন শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর। গত ৩০ জুন পেরুর রাজধানীতে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। রবিশঙ্কর তাঁর সংস্থা 'আর্ট অফ লিভিংস'-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে সমাজ সেবা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে চলেছেন। এই কাজের জন্য ভ্রমণ করছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। কিছুদিন আগেই রবিশঙ্কর কলম্বিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। সারা বিশ্বে শান্তি, মানবতা, সদভাবনা নির্মাণ করার জন্য আর্ট অফ লিভিংস্ বিভিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কাজে তিনি আয়োজন করছেন যোগের বিভিন্ন কার্যক্রম। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত ইরাক ও সিরিয়াতেও তিনি সেখানকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আমেরিকাতে রয়েছেন।

পাকিস্তানের সংসদে হিন্দু সাংসদের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের সোশাল মিডিয়ায় পাকিস্তানের সংসদে বক্তব্যরত এক হিন্দু সংসদের ভিডিও ফুটেজ খুব শেয়ার করা চলছে। খুব তারিফ করাও হচ্ছে। বিষয় হলো, পাকিস্তানের সংসদে সাংসদরা হিন্দু সাংসদ লালমহলিকে 'গো-পূজক' ও 'হিন্দু হিন্দু' বলে উপহাস করতে থাকে। তখন তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে থাকেন— 'হ্যাঁ, গোরুকে আমরা পূজা করি ও এটা আমাদের পরম্পরাগত সিদ্ধান্ত।'

উল্লেখ্য, গত ২০ জুন পাকিস্তানি সংসদে বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সাংসদরা হিন্দুদের বিষয়ে নানা উপহাস করতে থাকে। হিন্দু সাংসদ লালমহলি স্পিকারকে এ বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে কোনো লাভ না হওয়ায় তিনি চিৎকার করে এভাবেই তার প্রতিবাদ করেন।

ইউনেস্কোর নথিতে ভারতীয় ঐতিহ্য হিসেবে যুক্ত হলো যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমানে যোগাসন মানুষের কাছে অতি পরিচিত হলেও এর সূত্রপাত কিন্তু প্রাচীনকালে। প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা এই যোগ অনুশীলনের মাধ্যমেই নিজেদের শরীরচর্চা করে এসেছেন। আজকের দিনে এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে বেড়েছে। সম্প্রতি ইউনেস্কোর ডিরেক্টর জেনারেল ইরলিমা বোকোভা জানান, 'এই যোগাসনকে বর্তমানে ইউনেস্কোর রেজিস্টারে স্থান দেওয়া হলো।'

তিনি আরও জানান, এরকম অনেকগুলি ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে যেগুলিকে নথিভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি হলো :

কুটিয়াধাম : এই সংস্কৃত থিয়েটারের প্রচারের কাজ শুরু হয় ২০০১ সালে এবং ২০০৮ সালে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি পরম্পরাগত ভাবে কেরলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

রাম্মান : গারোয়াল-এর এটি একটি অতি প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথা পরম্পরাগত নাটক যা ২০০৯ সালে প্রচারের আলোয় আসে এবং এই বছরেই অন্তর্ভুক্ত হয়।

কালবেলিয়া : রাজস্থানের এই লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্য বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে তা আরও পরিচিত হয়ে ওঠে ইউনেস্কোর নথিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের পরে।

ছৌ : পূর্বভারতের একটি সুপরিচিত নৃত্য ছৌ। এটিও ২০১০ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বৈদিক স্তোত্র : বেদের ঋক্‌গুলি মৌখিক স্তোত্র হিসাবে পরম্পরাগত ভাবে পাঠ হয়ে আসছে। ২০০৩ সাল থেকে তা প্রচারের মধ্যে আসতে থাকে। এবং ২০০৮ সালে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়াও কেরলের মুদিয়েও, লাদাখের বৌদ্ধ স্ত্রোত্র, রামলীলা, পার্শীদের নওরোজ ইউনেস্কোর নথিতে পঞ্জীকৃত আছে। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
13 July - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা